وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আলক্বামা ইবনু ওয়ায়েল আল-কিনদী তার পিতা থেকে বর্ণিত আছে। একদা এক ব্যক্তি এক নারীকে ধর্ষণ করেছিল। এর বিচার করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে প্রস্তর আঘাতে হত্যা করো' (তিরমিযী, হা/১৪৫৪)।

● ৯ম বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● এপ্রিল ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের ব্যর্থতা: ইসলামী খেলাফতের উত্থান

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩، شوال و ذو القعدة ١٤٤٦هـ/أبريل ٢٠٢٥م العدد: ٦، الجزء: ١٠٢
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬ || ঈসায়ী ২০২৫ || বঙ্গীয় ১৪৩১-৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- এপ্রিল	০২-শাওয়াল	মঙ্গলবার	৪.৩৪	৫.৫০	১২.০২	৩.৩০	৬.১৫	৭.৩০
০৫- এপ্রিল	০৬-শাওয়াল	শনিবার	৪.৩০	৫.৪৬	১২.০১	৩.২৯	৬.১৬	৭.৩২
১০- এপ্রিল	১১-শাওয়াল	বৃহস্পতিবার	৪.২৪	৫.৪১	১২.০০	৩.২৭	৬.১৮	৭.৩৫
১৫- এপ্রিল	১৬-শাওয়াল	মঙ্গলবার	৪.১৯	৫.৩৬	১১.৫৮	৩.২৬	৬.২০	৭.৩৮
২০- এপ্রিল	২১-শাওয়াল	রবিবার	৪.১৪	৫.৩২	১১.৫৭	৩.২৪	৬.২২	৭.৪১
২৫- এপ্রিল	২৬-শাওয়াল	শুক্রবার	৪.০৯	৫.২৮	১১.৫৬	৩.২৩	৬.২৫	৭.৪৪
৩০- এপ্রিল	০১-যুলক্বা'দাহ	বুধবার	৪.০৪	৫.২৪	১১.৫৬	৩.২২	৬.২৭	৭.৪৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১
নরসিংদী	-১	-২	-২
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২
মাদারীপুর	+১	+১	০
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১
শরিয়তপুর	+১	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-১	-১	০
শেরপুর	০	০	+২
জামালপুর	+১	+১	+২
নেত্রকোনা	+১	-২	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৭
খাগড়াছড়ি	-৬	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৬	-৮	-৭
বান্দরবান	-৬	-৭	-৮
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-১
চাঁদপুর	০	-১	-২
ফেনী	-৩	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৭	-৭	-৬
সুনামগঞ্জ	-৫	-৫	-৪
মৌলভীবাজার	-৬	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৭	+৯
নাটোর	+৫	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩
বগুড়া	+৩	+৩	+৫
নওগাঁ	+৫	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৪	+৬

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+৩	+৬
দিনাজপুর	+৫	+৫	+৮
গাইবান্ধা	+২	+২	+৪
কুড়িগ্রাম	+১	+১	+৪
লালমনিরহাট	+১	+২	+৫
নীলফামারী	+৪	+৪	+৮
পঞ্চগড়	+৪	+৫	+৯
ঠাকুরগাঁও	+৫	+৬	+৯

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৪	+৩
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৫
যশোর	+৫	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৪	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৪	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৩
নড়াইল	+৪	+৩	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+১	০	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১
ঝালকাঠি	+২	+১	০
ভোলা	০	-১	-২
বরগুনা	+৩	+২	০

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

সূচিপত্র

৯ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৫
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩১-১৪৩২
শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
- শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
- মো: নাসির উদ্দিন
- আল আমিন
- আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
  ০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
  ০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
  ০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন! *-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল* ০৩

◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান *-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী* ০৫
» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-২য় পর্ব) *-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক* ০৮
» ঈদের মাসায়েল *-আল-ইতিছাম ডেস্ক* ১৩
» শাওয়ালের ছিয়াম রাখার আগে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা কি আবশ্যক? *-আব্দুল্লাহ মাহমুদ* ১৬
» খাবার গ্রহণের নববী তরীকা *-আব্দুল্লাহ আল-আমিন* ২০
» বিদ্যুৎ: আল্লাহর একটি মহান দান *-নাফিউল হাসান* ২৩
» মুসলিমদের প্রযুক্তিগত পুনর্জাগরণ: সময়ের অপরিহার্য দাবি *-আবু হিসান নাঈম* ২৪
» ফিলিস্তীনিদের উচ্ছেদ করা ইয়াহূদীদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মিসর সংকট *-মূল: আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ রাসলান, পরিমার্জিত অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার* ২৬
» অনৈক্যের ফলে বিশ্ব মুসলিমের পরিণতি *-মোস্তফা ইউসুফ আলম* ২৯

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের উপায় *-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ* ৩০

◈ তরুণ প্রতিভা
» রবের নিকট প্রকৃত সফলতা *-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল হাফীয* ৩৩

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» পহেলা বৈশাখের আড়ালে যত কথা *-ইবনু মাসউদ* ৩৪

◈ জামি'আহ পাতা
» তারা কেন অবহেলিত? *-মোছা. সুমাইয়া শোভা* ৩৭

◈ কবিতা ৩৯

◈ সংবাদ ৪১

◈ জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৪৪

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

গণতন্ত্রের ব্যর্থতা: ইসলামী খেলাফতের উত্থান

গণতন্ত্রকে আধুনিক বিশ্বে এমন এক অপরিহার্য শাসনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে মনে করা হয় সকল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্রেই নিহিত। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও যদি সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে বলা হয়, এর কারণ গণতন্ত্রের পর্যাপ্ত চর্চার অভাব। অর্থাৎ, গণতন্ত্রের সমাধান আরও বেশি গণতন্ত্র!

কিন্তু বাস্তবতা হলো, গণতন্ত্র নিজেই বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ব্যর্থতা। এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ ও অকার্যকর শাসনব্যবস্থা, যা প্রকৃত অর্থে জনগণের নয়, বরং ক্ষমতাসীন অভিজাতদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কিছু প্রধান কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা: গণতন্ত্র নামেই জনগণের শাসন, কিন্তু বাস্তবে এটি আমলাতন্ত্রনির্ভর একটি ব্যবস্থা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও প্রশাসনিক আমলাদের ক্ষমতার কাছে অনেক সময় যিম্মী হয়ে পড়েন। ফলে সাধারণ জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয় এবং তাদের অধিকার আদায়ের প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতার শিকার হয়।

২. রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া আধিপত্য: গণতন্ত্র জনগণের শাসন নয়, বরং প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের শাসন। জনগণের হাতে সরাসরি প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষমতা থাকে না; বরং রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সুবিধামতো প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং জনগণকে বাধ্য করা হয় সেই সীমিত বিকল্পের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিতে।

৩. কর্পোরেট ও এলিট শ্রেণির প্রভাব: গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, রাজনৈতিক দলগুলো কর্পোরেট ও অভিজাত শ্রেণির অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়। বিশ্বের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এটি স্পষ্ট—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে ইলন মাস্কের প্রভাব ছিল দৃশ্যমান। দিনশেষে, ক্ষমতা কেবল হাতে গোনা কয়েকজন পুঁজিবাদী অভিজাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার: গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সকল জনগণের শাসন নয়, বরং এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এখানে সংখ্যালঘুর মতামতের আইনি কোনো মূল্য থাকে না। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মানদণ্ড হতে পারে না, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সব সময় ন্যায়সংগত বা নীতিগতভাবে সঠিক হবে—এমন নিশ্চয়তা নেই।

৫. গণতন্ত্র একটি আধুনিক ধর্ম: পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রশ্ন করা এক ধরনের ট্যাবুতে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র একপ্রকার সেক্যুলার ধর্মে রূপ নিয়েছে, যেখানে নির্বাচন হলো সেই ধর্মের পূজার আচার। অথচ প্রকৃত স্বাধীনতা হলো এই গণতান্ত্রিক মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করা। গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে ৫১% জনগোষ্ঠী মিলে বাকি ৪৯% জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে পারে। ভোট প্রদান প্রক্রিয়া হচ্ছে স্বাধীনতা হরণের বিনিময়ে প্রাপ্ত ক্ষমতার ভ্রান্ত বিলাস। অর্থাৎ ভোট প্রদানের তাৎক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে ৫ বছরের জন্য দুর্নীতি, লুটপাট, খুন-গুম ও যুলমের সুযোগ। গত ১৬ বছর বাংলাদেশে ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠিত ছিল গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের নামেই। তথা গত ১৬ বছরের সকল খুন-গুমের জন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়ী না করে সরাসরি গণতান্ত্রিক সিস্টেমকে দায়ী করা প্রকৃত স্বাধীনতা।

প্রকৃত গণতন্ত্র কেমন হতে পারে?

গণতন্ত্রকে যদি প্রকৃত অর্থেই গণতন্ত্র হতে হয় তাহলে গ্রামের মানুষজনকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তারা কোনো প্রকার রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ছাড়া এবং রাজনৈতিক দল ছাড়াই নিজেরা গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে তাদের মধ্যে যোগ্য একজনকে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের নেতা ঘোষণা করবে। অতঃপর একটি ইউনিয়নের সকল গ্রামের নেতারা মিলে তাদের মধ্যের ইউনিয়ন নেতা নির্ধারণ করবে। তারপর সকল ইউনিয়ন নেতা মিলে তাদের মধ্যে উপজেলা নেতা নির্ধারণ করবে। তারপর সকল উপজেলা নেতা মিলে তাদের এমপি নির্ধারণ করবে। এইভাবে পরামর্শভিত্তিক ধারাবাহিক পদ্ধতিতে পুরো দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট নির্ধারিত হবে। এটিই প্রকৃত গণতন্ত্র।

পরিশেষে, যেখানে গণতন্ত্র নিজেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ, সেখানে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আশা কেবল দিবাস্বপ্ন। গণতন্ত্র একটি অকার্যকর ব্যবস্থা, যা কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু একদিন অবশ্যই এই গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত— যেখানে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। *(প্র. স.)*

উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন!

*-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

সরল অনুবাদ: আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে’।[১]

হাদীছটির অবস্থান: উপরিউক্ত হাদীছটি ঐ সকল মহান হাদীছের অন্যতম, যার উপর দ্বীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যদি উপরিউক্ত হাদীছের আলোকে আমল করে, তাহলে তাদের মধ্যকার অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় ও দ্বন্দ্ব-কলহ দূর হয়ে যাবে। সমাজে নিরাপত্তা, কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করবে। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের হৃদয় সীমালঙ্ঘন, প্রতারণা ও হিংসা থেকে মুক্ত হবে। মর্যাদার বিচারে কেউ তাকে অতিক্রম করুক বা তার সমকক্ষ হোক হিংসুক তা চায় না। কারণ সে তার গুণাবলি দ্বারা মানুষের উপর বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হতে পছন্দ করে এবং তাদের মধ্যে অনন্য হতে চায়। অথচ ঈমানের দাবি এর বিপরীত। আর তা হচ্ছে, মুমিনরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কল্যাণে সবাই অংশগ্রহণ করতে চায়। কারোটা কমিয়ে দেওয়া হোক, তা তারা চায় না।[২]

ব্যাখ্যা: প্রতিপালকের সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রক্ষার পাশাপাশি মানুষ যেন নিজেদের মধ্যে আন্তরিক এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, এমন শিক্ষা ও বিধিবিধানের প্রতি ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ লাভ করতে পারে এবং মুসলিম সমাজে ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা বিরাজ করে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন সমাজের প্রতিটি সদস্য অন্যের স্বার্থের প্রতি ঐরূপ আন্তরিক হবে, যেমন সে তার নিজের স্বার্থের প্রতি আন্তরিক হয়ে থাকে। এভাবে ইসলামী সমাজ দৃঢ় বন্ধন ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংহতি ও পরার্থপরতার নীতি অর্জনে তাঁর উম্মতকে পথ দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে’।[৩] এভাবে মানুষের হৃদয়ে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।

আমরা যদি হাদীছটি নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, আমাদের হৃদয়ে ঈমানের উক্ত রূপের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব, যখন আমরা একে অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হব এবং উক্ত আচরণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে অন্যের সাথে লেনদেনে নৈতিক হব। এজন্য যদি কেউ কোনো মানুষ কর্তৃক কষ্ট পায়, তবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে তাদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যারা আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের ক্ষমা করতে হবে এবং তাদের কল্যাণ কামনা করতে হবে। কেবল তাই নয়, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে। তারা অসুস্থ হলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। অভাবগ্রস্ত হলে সহায়তা করতে হবে। ইয়াতীম এবং বিধবাকে সাহায্য করতে হবে। প্রশস্ত হৃদয়ে এবং পবিত্র আত্মা নিয়ে অন্যকে সহায়তা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না।

তিনি যেমন দুনিয়ায় মানুষের সুখ পছন্দ করেন, তেমনি পরকালে তাদের সুখী হওয়াকে ভালোবাসেন। তাই তিনি সর্বদা মানবজাতিকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতে চান। নিম্নবর্ণিত আয়াতের শিক্ষার আলোকে তিনি মানুষের সাথে লেনদেন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা আল্লাহকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, আমি মুসলিম। তাদের চেয়ে আর কে অধিক উত্তম হতে পারে?’ *(ফুছছিলাত, ৪১/৩৩)*।

হাদীছটি অমুসলিমদের প্রতি কল্যাণকামিতাপূর্ণ ভালোবাসাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তাদের সাথে এমন আচরণ করা, যা তাদের জন্য আল্লাহর উপর ঈমান আনার পথকে সুগম করে এবং আল্লাহর সাথে শিরক ও অবাধ্যতার অন্ধকার থেকে রক্ষা করে। উপর্যুক্ত হাদীছের অপর একটি সূত্র তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, যা উল্লিখিত অর্থের প্রমাণ বহন করে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫।

২. ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৪৫।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫।

বলেছেন, 'আর মানুষের জন্য তাই ভালোবাসো, যা তুমি নিজের জন্য ভালোবাস; তবেই তুমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে'।[৪]

অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং তার কল্যাণকামিতার ক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম কল্যাণকামী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। অন্যের কল্যাণ সাধনে তিনি এমন কোনো উপায় নেই, যা অবলম্বন করেননি এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্য উপকারী এমন কোনো পথ নেই, যা তিনি অনুসরণ করেননি। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, 'হে আবূ যার! আমি (প্রশাসনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে) তোমাকে দুর্বল মনে করছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালোবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালোবাসি। (নেতৃত্ব দানের উপযোগী গুণাবলির অভাবে তুমি কষ্টের মধ্যে পতিত হবে) কাজেই তুমি যদি দুজন মানুষকে নেতৃত্ব দানের সুযোগ পাও, তবুও তা গ্রহণ করো না এবং ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া থেকে বিরত থেকো'।[৫]

মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'সর্বোত্তম ঈমান হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা আর সর্বদা আল্লাহর স্মরণে জিহ্বা সিক্ত রাখা'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা এবং আল্লাহর যিকিরে জিহ্বাকে সিক্ত রাখা বলতে কী বোঝায়? তিনি বললেন, 'তুমি লোকেদের জন্য যা পছন্দ করো, নিজের জন্য তা-ই পছন্দ করবে এবং তাদের জন্য তা-ই অপছন্দ করবে, যা নিজের জন্য অপছন্দ কর আর ভালো কথা বলবে নতুবা নীরব থাকবে'।[৬]

অন্যের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একে স্মরণে রাখতে বলেছেন। আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক; তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে'।[৭]

আমাদের সৎকর্মপরায়ণ পূর্বপুরুষগণ তাদের কাঁধে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর এই আদেশ বহন করেছেন। সর্বোত্তম উপায়ে এটি পালনের ক্ষেত্রে তারা বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেছেন, যখন আমি কুরআনের কোনো আয়াতের তাফসীরের উপর দিয়ে অতিবাহিত হই, তখন আমি চাই যে, আমি সেখান থেকে যে শিক্ষা অর্জন করেছি সমস্ত লোক তা থেকে উপকৃত হোক।[৮]

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসে' নামক একজন বিখ্যাত পূর্বপুরুষ যখন তার একটি গাধা বিক্রি করতে চাইলেন, তখন এক লোক তাকে বললেন, আপনি কি এটি আমার জন্য পছন্দ করবেন? তখন তিনি বললেন, যদি এটি আমি আপনার জন্য পছন্দ না করতাম; তবে একে আপনার নিকট বিক্রি করতাম না।[৯] এগুলো ও অন্যান্য উদাহরণ তাদের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত, যেখানে তারা পৌঁছেছেন। যার ফলস্বরূপ আমাদের জন্য এই সম্মানজনক মনোভাব তৈরি হয়েছে।[১০]

এই হাদীছের অন্যতম দাবি হলো, একজন মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তাই ঘৃণা করে, যা সে নিজের জন্য ঘৃণা করে। এর ফলে সে অনেক নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য বর্জনে উৎসাহিত হয়। যেমন- হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যের প্রতি ঘৃণা, স্বার্থপরতা, লোভ ও অন্যান্য নিন্দনীয় বৈশিষ্ট। যেসব আচরণ মানুষ তার সাথে করুক, তা তিনি চান না।

পরিশেষে এই মহান হাদীছ নিয়ে কাজ করার অন্যতম ফল হচ্ছে— জাতির মধ্যে এমন এক পুণ্যময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যে সমাজের প্রতিটি সদস্য সামাজিক ভালোবাসার গভীর বন্ধন উপভোগ করবে। সমাজের প্রতিটি সদস্য একটি দেহের অঙ্গের মতো পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত থাকবে, যা কোনো দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হবে না কিংবা কোনো বিপদে পরাভূত হবে না। যাতে এমন আদর্শের আলোকে গড়ে ওঠা একটি জাতি চূড়ান্ত সুখ ভোগ করতে পারে। এমন আদর্শে গঠিত সমাজের চূড়ান্ত রূপ হলো ঐটি, যা আমরা বাস্তবে দেখতে পাই। আল্লাহ আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪. তিরমিযী, হা/২৩০৫।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৬।
৬. আহমাদ, হা/৮০৯৫; ইবনু মাজাহ, হা/৪২১৭।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৮২।
৮. ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৪৫।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. মাজাল্লাতুল বায়ান, পৃ. ৪৫।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

ভূমিকা:

'মুরদান' কারা? তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে কিনা? তাদের সাথে সম্পর্কিত আরও কোনো বিধিবিধান আছে কিনা? এ ব্যাপারগুলো আমার ততটা জানা ছিল না। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষেরই এ বিষয়টি অজানা। যাহোক, সম্প্রতি 'যে পাপ পশুও করে না' শিরোনামে একটি খুৎবা প্রস্তুত করতে যেয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম এবং এই বিষয়টি নজরে আসল। তারপর থেকে এ ব্যাপারে লেখা ও বলার খুব প্রয়োজনবোধ করছিলাম। কারণ আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সার্বিক জীবনে এ বিষয়টি জানা খুবই দরকার। অন্যথা নিজের অজান্তেই গোনাহ হয়ে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি আছে বৈকি। বরং মহাপাপ সমকামিতা পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযতে রাখুন।

সব যুগে ও সব সমাজে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানা ও ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক চলা সকলের উপর অপরিহার্য। কারণ সর্বযুগে ও সব সমাজে মুরদান তথা কিশোর-তরুণেরা ছিল, আছে এবং থাকবে। বিশেষ করে স্কুল-মাদরাসাসহ যেখানে যেখানে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের আনাগোনা বেশি থাকে এবং তাদের সাথে মিশতে হয়, ওঠাবসা করতে হয়, সেসব জায়গায় কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী।

এ লেখায় আমি মুরদান বা দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক সম্পর্কে ইসলামের বিধিবিধান কী হতে পারে, তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহ একক তাওফীক্বদাতা।

মুরদান কারা?

'মুরদান' (مُرْدَانٌ) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, 'আমরাদ' (أَمْرَدُ)।[১] 'আমরাদ' এমন তরুণ, যার দাড়ি বের হওয়ার বয়স হয়ে গেছে, গোঁফ গজাতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও দাড়ি বের হয়নি।[২]

বুজাইরিমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الْمُرَادُ بِالْأَمْرَدِ مَنْ لَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى أَوَانِ إِنْبَاتِهَا غَالِبًا 'আমরাদ দ্বারা এমন মানুষ উদ্দেশ্য, যার এখনও দাড়ি গজায়নি এবং বেশির ক্ষেত্রে দাড়ি উঠার বয়সও হয়নি'।[৩]

অতএব, দাড়িবিহীন শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবকরা মুরদানের আওতাভুক্ত হবে। তবে যেসব তরুণের দাড়ি-গোঁফ এখনও গজায়নি; কিন্তু গজানোর উপক্রম হয়েছে, তারা এই তালিকার শীর্ষে থাকবে।

উল্লেখ্য, আমি এই লেখায় 'আমরাদ' বা 'মুরদান' শব্দের ভাবার্থ হিসেবে 'দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক' শব্দ ব্যবহার করেছি।

আরও একটি বিষয় বলে রাখি, এখানে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকরা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেও উদ্দেশ্য কেবল তারাই নয়। বরং তাদের ক্ষেত্রে যা যা ঘটতে পারে, তা যদি অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে, তাহলে তারাও এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তবে, এ ধরনের দাড়িবিহীন সুশ্রী কিশোর-তরুণ-যুবকদের প্রতি নারী-পুরুষ যে কারোরই ভিন্ন আকর্ষণ হতে পারে এবং হওয়া সহজ বলে তাদের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে তাকানোর বিধান:

প্রথমত: আমরা জানি, যা কিছু ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে বা কামভাবের উদ্রেক ঘটাতে পারে অথবা হারাম বিষয়ে নিমজ্জিত করতে পারে, তার সবকিছুর দিকে দৃষ্টি দিতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

'মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে' *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*।

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

الْبَصَرُ هُوَ الْبَابُ الْأَكْبَرُ إِلَى الْقَلْبِ، وَأَعْمَرُ طُرُقِ الْحَوَاسِّ إِلَيْهِ، وَبِحَسَبِ ذَلِكَ كَثُرَ السُّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ. وَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ، وَغَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَكُلِّ مَا يُخْشَى الْفِتْنَةُ مِنْ أَجْلِهِ.

'চোখ হচ্ছে হৃদয়ে প্রবেশের সবচেয়ে বড় দরজা এবং ইন্দ্রিয়সমূহে ঢোকার সবচেয়ে উর্বর পথ। এই চোখের কারণেই পদস্খলন ঘটে। ফলে সে ব্যাপারে সতর্ক করা জরুরী। চোখের কারণে যত হারাম কাজ হতে পারে এবং যত ধরনের ফেতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তার সবগুলো থেকে চোখতে অবনমিত রাখা অপরিহার্য'।[৪]

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. দোযী, তাকমিলাতুল মা'আজিম আল-আরাবিয়্যাহ, (ইরাক: সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম মন্ত্রণালয়, ১ম মুদ্রণ: ১৯৭৯-২০০০ খৃ.), ১০/৩৯।

২. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব, (বৈরূত: দারু ছদির, ৩য় মুদ্রণ: ১৪১৪ হি.), ৩/৪০০১।

৩. সুলায়মান আল-বুজাইরিমী, হাশিয়াতুল বুজাইরিমী আলাল খত্বীব, (দারুল ফিকর: ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খৃ.), ৩/৩৮৩।

৪. কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন -তাফসীর কুরতুবী- (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ: ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.), ১২/২২৩।

আল্লামা সা'দী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَرْشِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَقُلْ لَهُمْ: الَّذِيْنَ مَعَهُمْ إِيْمَانٌ، يَمْنَعُهُمْ مِنْ وُقُوْعِ مَا يُخِلُّ بِالْإِيْمَانِ: {يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ وَإِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَإِلَى الْمُرْدَانِ الَّذِيْنَ يُخَافُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَى زِيْنَةِ الدُّنْيَا الَّتِيْ تَفْتِنُ، وَتُوْقِعُ فِي الْمَحْذُوْرِ.

'আপনি মুমিনদেরকে নির্দেশনা দিন এবং তাদেরকে বলুন, যাদের সাথে ঈমান আছে, সেই ঈমানের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে এমন বিষয় থেকে তাদেরকে তাদের ঈমানই বাধা প্রদান করবে: **তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে** গোপন বিষয়সমূহ থেকে, বেগানা নারীদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে এবং এমন কিশোর-যুবকের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে, যাদের দিকে তাকালে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপভাবে তারা দুনিয়াবী এমন সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে তাদের চোখকে অবনমিত রাখবে, যেসব সৌন্দর্য ফেতনায় ফেলতে পারে এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে নিপতিত করতে পারে'।[৫]

অতএব, নারী-পুরুষ কারো জন্যই এমন জিনিসের দিকে তাকানো সমীচীন হবে না, যেদিকে তাকালে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে বা তাকে ফেতনায় ফেলতে পারে অথবা হারাম বিষয়ে প্রবেশ করাতে পারে।

দ্বিতীয়ত: দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে কামভাবের[৬] সাথে তাকালে নিষিদ্ধ হবে নাকি স্বাভাবিকভাবেও তাকানো যাবে না? নাকি ফেতনার ঝুঁকি থাকলেও তাকানো যাবে না? তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদকে চারভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

(১) কেউ কেউ বলেছেন, দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক তো বটেই, এমনকি কামভাব নিয়ে কারো দিকেই তাকানো যাবে না। বরং কামভাব নেই, কিন্তু ফেতনার ঝুঁকি আছে, এমতাবস্থায়ও তাকানো যাবে না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

الصَّبِيُّ الْأَمْرَدُ الْمَلِيحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ...وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ؛ بَلْ يَحْرُمُ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ النَّظَرُ إِلَيْهِ عِنْدَ خَوْفِ ذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ لِحَاجَةٍ بِلَا رِيبَةٍ مِثْلَ مُعَامَلَتِهِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ لِلْحَاجَةِ.

'সুশ্রী শিশু-কিশোর অনেক ক্ষেত্রে বেগানা নারীর মতো।...এই কারণে সকল মানুষের ঐকমত্যে ফেতনার ঝুঁকিসহ তাদের দিকে তাকানো জায়েয নেই। বরং অধিকাংশ আলেমের নিকট ফেতনার আশঙ্কা থাকলে তাদের দিকে তাকানো হারাম। সেজন্য, শুধু দরকার হলে তাদের দিকে তাকানো যাবে; সন্দেহের চোখে তাকানো যাবে না। যেমনটি প্রয়োজনের সময় নারীর দিকেও তাকানো যায়। যেমন- কোনো কিছু লেনদেনের সময়, সাক্ষ্য প্রদান বা গ্রহণের সময়'।[৭]

উল্লেখ্য, এখানে সুশ্রী কথাটা দর্শকের প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। কারণ সবার চোখে সুন্দরের সংজ্ঞা একরকম নয়। সেজন্য, একজন কালো মানুষও কারো চোখে সুন্দর হতে পারে। আরেকটা কথা হচ্ছে, এখানে সুশ্রী আর বিশ্রী মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, কামভাবের সাথে দৃষ্টি দেওয়া।

ইবনু মুফলিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْغُلَامِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ 'কামভাব ছাড়া কিশোর-বালকের দিকে তাকানো জায়েয'।[৮]

তিনি আরো বলেন, وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لِشَهْوَةٍ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَعْنَى الشَّهْوَةِ: أَنْ يَتَلَذَّذَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ 'যাদের কথা উল্লেখ করলাম[৯], তাদের কারো দিকে কামভাবসহ তাকানো জায়েয নেই। কারণ এতে ফেতনা রয়েছে। এখানে কামভাবের অর্থ হচ্ছে, চোখের স্বাদ গ্রহণ'।[১০]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ لِشَهْوَةٍ كَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِالشَّهْوَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّهْوَةُ شَهْوَةَ الْوَطْءِ، أَوْ شَهْوَةَ التَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ، فَلَوْ نَظَرَ إِلَى أُمِّهِ، وَأُخْتِهِ، وَابْنَتِهِ يَتَلَذَّذُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا كَمَا يَتَلَذَّذُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَانَ مَعْلُومًا لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ، فَكَذَلِكَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

'মাহরাম নারী ও বেগানা নারীর দিকে কামভাবসহ তাকানো যেমন, দাড়িবিহীন তরুণ-যুবকের দিকে কামভাবসহ তাকানোও তেমন। এই কামভাব যৌন কামভাব হোক বা দৃষ্টির স্বাদ গ্রহণের কামভাব হোক- যেটাই হোক-না কেনো। অতএব, কেউ যদি তার মা, বোন ও মেয়ের দিকে চোখের স্বাদ নেওয়ার জন্য তাকায়, ঠিক যেমনটা বেগানা নারীর চেহারার দিকে চোখের স্বাদ নেওয়ার জন্য তাকায়, তাহলে সবার জানা যে, এই ধরনের তাকানো হারাম। অনুরূপভাবে দাড়িবিহীন তরুণ-যুবকদের দিকে তাকানোও ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম'।[১১]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ-এর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এখানে কামভাব দ্বারা দুই ধরনের কামভাব উদ্দেশ্য: যৌন কামভাব ও দৃষ্টির স্বাদ গ্রহণের কামভাব। সেজন্য, ইবনুল কত্তান বলেছেন, أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى غَيْرِ الْمُلْتَحِي بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ وَتَمَتُّعِ الْبَصَرِ بِمَحَاسِنِهِ 'সৌন্দর্য দেখে চোখের স্বাদ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দাড়িবিহীন ব্যক্তির দিকে তাকানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে

৫. আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ: ১৪২০ হি./২০০০ খৃ.), পৃ. ৫৬৬।

৬. এখানে কামভাব বলতে যৌন কামভাবও হতে পারে আবার চোখের মজা নেওয়াও হতে পারে, যেমনটা আমরা এই লেখার বিভিন্ন জায়গায় উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে দেখতে পাব ইনশা-আল্লাহ।

৭. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২১/২৪৫।

৮. ইবনু মুফলিহ, আল-মুবদি' ফী শারহিল মুক্বনি' (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ: ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.), ৬/৮৯।

৯. যাদের কথা ইবনু মুফলিহ উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে দাড়িবিহীন কিশোর, তরুণ, যুবকও আছে।

১০. আল-মুবদি' ফী শারহিল মুক্বনি', ৬/৮৯।

১১. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২১/২৪৫।

কেরাম ইজমা পোষণ করেছেন'।[১২]

(২) দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে দৃষ্টি দিলে কামভাব হবে কিনা এমন সন্দেহ হলেও তাদের দিকে তাকানো ঠিক হবে না। ইবনু আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إِذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ 'মেয়েদের চেহারা দেখা হারাম এবং কামভাব হতে পারে মর্মে সন্দেহ হলে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের চেহারা দেখাও হারাম'।[১৩]

(৩) কারো কারো মতে, দাড়িবিহীন সুশ্রী কিশোর, তরুণ, যুবকের দিকে কোনোভাবেই তাকানো ঠিক হবে না। ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ فِي الْأَمْرَدِ هُوَ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ الْعَذَارَى فَإِطْلَاقُ الْبَصَرِ مِنْ أَعْظَمِ الْفِتَنِ 'দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের ব্যাপারে সালাফগণ বলতেন, কুমারী মেয়েদের চেয়ে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক বেশি ফেতনাময়। সুতরাং (তাদের দিকে) চোখ তুলে তাকানো বড় ফেতনার অন্তর্ভুক্ত'।[১৪]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصُّورَةِ سَوَاءٌ كَانَ نَظَرُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا سَوَاءٌ أَمِنَ الْفِتْنَةَ أَمْ خَافَهَا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحُذَّاقُ أَصْحَابِهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَهَى كَمَا تُشْتَهَى وَصُورَتُهُ فِي الْجَمَالِ كَصُورَةِ الْمَرْأَةِ بَلْ رُبَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ بَلْ هُمْ فِي التَّحْرِيمِ أَوْلَى لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ فِي حَقِّهِمْ مِنْ طُرُقِ الشَّرِّ مالا يَتَمَكَّنُ مِنْ مِثْلِهِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ شرعية فيجوز النظر كما فِي حَالَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّطَبُّبِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَحْرُمُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّ الْحَاجَةَ تُبِيحُ النَّظَرَ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَأَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا قَالَ أَصْحَابُنَا النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْإِنْسَانِ النَّظَرُ إِلَى أُمِّهِ وَبِنْتِهِ بِالشَّهْوَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

'দাড়িবিহীন তরুণ-যুবকের দিকে তাকানো যেকোনো ব্যক্তির জন্য হারাম, যদি সে সুদর্শন হয়। এক্ষেত্রে কামভাবসহ তাকাক বা কামভাব ছাড়া তাকাক; অনুরূপভাবে ফেতনামুক্ত থাক বা ফেতনার ঝুঁকি থাক— কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্লেষক আলেম-উলামার নিকট এটাই বিশুদ্ধ মত। শাফেঈ ও তার বিচক্ষণ অনুসারীগণ এমতের পক্ষেই কথা বলেছেন। শাফেঈর দলীল হচ্ছে, দাড়িবিহীন তরুণ-যুবকেরা মেয়েদের মতোই। কারণ মেয়েদের প্রতি যেমন কামভাব তৈরি হয়, তেমনি দাড়িবিহীন তরুণ-যুবকের প্রতিও কামভাব তৈরি হতে পারে। সৌন্দর্যের দিক থেকে নারীদের চেহারা যেমন, এদের চেহারাও তেমন; বরং অনেক নারীর চেহারার চেয়ে অনেক তরুণ-যুবকের চেহারা বেশি সুন্দর। তাছাড়া আরেকটি দিক বিবেচনায় দাড়িবিহীন তরুণ-যুবকের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার বিষয়টি আরো যৌক্তিক। সেটি হচ্ছে, এ শ্রেণির তরুণ-যুবকের দিকে খারাপ পথ পাড়ি দেওয়া যতটা সহজ, নারীদের ক্ষেত্রে ঐ রাস্তায় হাঁটা ততটা সহজ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাকানো হারাম হওয়ার এই বিষয়টি সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে তাকানোর দরকার নেই। কিন্তু যদি আসলেই তাকানোর দরকার হয়, তাহলে তাকানো জায়েয। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, সাক্ষ্য প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ইত্যাদি। কিন্তু এসব অবস্থাতেও কামভাবসহ তাকানো হারাম। কারণ প্রয়োজন তাকানোর বৈধতা দিয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। কিন্তু কামভাবের তো আর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের মতাবলম্বীগণ বলেছেন, স্বামী ও দাসীর মালিক ছাড়া সবার জন্য কামভাব নিয়ে তাকানো হারাম। এমনকি কারো জন্য কামভাব নিয়ে তার মা ও মেয়ের দিকে তাকানোও হারাম। আল্লাহই ভালো জানেন'।[১৫]

(৪) কামভাব ও ফেতনামুক্তভাবে তাকালে দোষের কিছু নেই। তবে, এক্ষেত্রেও দু'টি দিক খেয়াল রাখতে হবে: কামভাব হবে না মর্মে নিশ্চিন্ত থাকলে তাকানো যাবে। কিন্তু সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকলে তাকানো যাবে না।[১৬]

এখানে আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে— কামভাব হবে না মর্মে নিশ্চিন্ত থাকলেও বারবার তাকানো যাবে না। কারণ বারবার দৃষ্টি নিবদ্ধের মধ্যে সাধারণত কোনো-না কোনো গড়বড় থাকে। সেজন্য, ইবনু আক্বীল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, تَكْرَارُ النَّظَرِ إِلَى الْأَمْرَدِ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ 'দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে বারবার তাকানো হারাম। কেননা কামভাব ছাড়া বারবার তাকানো হতে পারে না'।[১৭]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَمَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ إِلَى الْأَمْرَدِ وَنَحْوِهِ، أَوْ أَدَامَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَا أَنْظُرُ لِشَهْوَةٍ كَذَبَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَاعٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى النَّظَرِ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ إِلَّا لِمَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ اللَّذَّةِ بِذَلِكَ. وَأَمَّا نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ فَهِيَ عَفْوٌ إِذَا صَرَفَ بَصَرَهُ.

'যে ব্যক্তি দাড়িবিহীন তরুণ-যুবক বা এরকম কারো দিকে বারবার তাকায় অথবা অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে আর বলে যে, আমি কামভাব নিয়ে তাকাই না, সে আসলে ঐ ব্যাপারে মিথ্যা বলছে। কারণ তার প্রয়োজন না পড়লে সে এভাবে তাকাত না। বরং তাকানোর মাধ্যমে মনের স্বাদ পাওয়ার কারণেই সে তাকায়। তবে হঠাৎ চোখ পড়লে যদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য'।[১৮]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১২. ইবনু আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ-দুর্রিল মুখতার, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ: ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.), ১/৪০৭।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. আল-বুহূতী, কাশশাফুল ক্বিনা' আন মাতনিল ইক্বনা' (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), ৫/১৬।

১৫. নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ (বৈরূত: দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ২য় মুদ্রণ: ১৩৯২ হি.), ৪/৩১।

১৬. দ্রষ্টব্য: আল-মারদাবী, আল-ইনছাফ ফির রজিহ মিনাল খিলাফ (বৈরূত: দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ২য় মুদ্রণ, তা. বি.), ৮/২৮-২৯।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, (মদীনা: বাদশা ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স: ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.), ১/২৮৭।

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-২য় পর্ব)

بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ.

পরিচ্ছেদ: ৩/২. শিক্ষক যখন কোনো কথায় ব্যস্ত থাকেন, তখন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে কথা শেষ করে উত্তর দেওয়া:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ - أُرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

৫৯. ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন সিনান হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ফুলাইহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন, আমাকে ইবরাহীম বিন মুনযির হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা ফুলাইহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে হিলাল বিন আলী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি আত্বা বিন ইয়াসার থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে লোকদেরকে হাদীছ শুনাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্বিয়ামত কখন (সংঘটিত হবে)?' তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। তখন কিছু মানুষ বললেন, 'আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নটি শুনেছেন; কিন্তু তিনি তার কথা পছন্দ করেননি'। অপর কিছু মানুষ বললেন, 'তিনি তার কথা শুনতে পাননি'। অতঃপর আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনা শেষ করে বললেন, 'ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়?' বেদুঈন ব্যক্তি বললেন, 'এই যে আমি, হে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'যেদিন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে, সেদিন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'। বেদুঈন ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কীভাবে আমানত নষ্ট হবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখনই ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'।

তাখরীজ: হাদীছটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মুনযির থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ থেকে। হাদীছটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সিনান থেকে। হাদীছটি আরও বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল[১] ইউনুস বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী ও সুরাইজ বিন নু'মান আল-জাওহারী থেকে। হাদীছটি আরও বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনু হিব্বান[২] উমার আস-সামারকান্দী থেকে, তিনি আবূ মূসা আয-যামিন থেকে, তিনি উছমান বিন ফারেস থেকে।

তারা সকলেই (মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ, ইউনুস, সুরাইজ ও উছমান বিন ফারেস) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ফুলাইহ থেকে। তিনি হিলাল বিন আলী থেকে, তিনি আত্বা বিন ইয়াসার থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) মুহাম্মাদ বিন সিনান: তিনি একজন মযবূত রাবী। সকল ইমাম তার মযবূতির বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।[৩]

(২) ইবরাহীম বিন মুনযির: তিনিও একজন মযবূত রাবী। সকল ইমাম তার মযবূতির বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।[৪]

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. আহমাদ, হা/৮৮৫০।

২. ইবনু হিব্বান, হা/১০৪।

৩. তাহযীবুত তাহযীব, ৩/৫৮১।

(৩) মুহাম্মাদ ফুলাইহ ও ফুলাইহ বিন সুলায়মান: তারা উভয়ে পিতা ও পুত্র। তাদের নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। তাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ:

মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ :

১. ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (মৃত্যু: ২৩৩ হি.) বলেন, ليس بثقة ولا ابنه অর্থাৎ ফুলাইহ বিন সুলায়মান এবং তার ছেলে কেউই নির্ভরযোগ্য নয়।[৫]

তাহক্বীক্ব: মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে আহমাদ বিন আবী খায়ছামা-এর রেওয়ায়েতে ইমাম ইবনু মাঈন থেকে উদ্ধৃতি করা হয়েছে। তিনি এই রাবীর বিষয়ে বলেন, أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة قد كتبت عنه অর্থাৎ রাবী নির্ভরযোগ্য রাবী, আমি তার থেকে হাদীছ লিখেছি।[৬]

উল্লেখ্য, তারীখ ইবনু আবী খায়ছামা-তে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন থেকে এই বর্ণনাটি এই রাবীর আলোচনায় আমরা পাইনি। তবে ইবনু আবী হাতিম তার আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে এই মন্তব্যটি মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসাদী নামক রাবীর আলোচনায় পেশ করেছেন।[৭] কিন্তু আসাদীকে অনেক মুহাদ্দিছ মিথ্যুক বলেছেন, এমনকি স্বয়ং ইমাম ইবনু মাঈনও মিথ্যুক বলেছেন।[৮] সেই হিসেবে একই রাবীকে মিথ্যুক ও মযবূত বলা পরস্পর চরম বিরোধী মন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যা অসম্ভব। হয়তো এজন্যই এই মন্তব্যটি ইমাম যাহাবী আমাদের আলোচিত রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২. ইমাম আবূ হাতিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ২৭৭ হি.), তিনি ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুল্লাহ-এর উপরের মন্তব্যটি পেশ করার পর বলেন, كان يحيى بن معين يحمل على محمد ابن فليح بن سليمان فقلت لابي فما قولك فيه قال ما به بأس ليس بذاك القوى অর্থাৎ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহকে ত্রুটিযুক্ত বলতেন। আমি আমার পিতা আবূ হাতিমকে জিজ্ঞেস করলাম, তার বিষয়ে আপনার কী মন্তব্য? তিনি বললেন, 'তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই; তবে তিনি অতটা মযবূত নন'।[৯]

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনের মন্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ হাতিমের এই মন্তব্যে বুঝা যায়, রাবী খুব শক্তিশালী নন; তবে তার হাদীছ গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই।

৩. ইমাম আবূ যুরআ' আর-রাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, قيل له فليح فحرك رأسه وقال واهي الحديث هو وابنه محمد ابن فليح جميعا واهيان অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ফুলাইহ সম্পর্কে, তিনি তার মাথা ঝোঁকালেন এবং বললেন, 'হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল'। তিনি ও তার ছেলে উভয়েই 'হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল'।[১০]

তাহক্বীক্ব: 'ওয়াহিল হাদীছ' শব্দটি সাধারণভাবে কঠিন দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও ইমাম আবূ যুরআ' রাহিমাহুল্লাহ ২য় স্তরের দুর্বলতা-বাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন তথা তার নিকটে 'ওয়াহিল হাদীছ' শব্দটি হালকা দুর্বলতার দিকে ইশারা করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. সাদী হাশমী।[১১]

৪. ইমাম উকাইলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ অর্থাৎ তার হাদীছের মুতাবি' (অনুগামী বর্ণনা) পাওয়া যায় না।[১২]

ব্যাখ্যা: ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এই মন্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন, كثير مِن الثِّقات قد تفردوا فيصحّ أن يقال فيهم لا يُتابَعُون عَلَى بعض حديثهم অর্থাৎ অনেক নির্ভরযোগ্য রাবীই এককভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কাজেই তাদের কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে এরকম বলা শুদ্ধ যে, 'এগুলোর কোনো অনুগামী বর্ণনা পাওয়া যায় না'।[১৩] ইমাম যাহাবী এখানে ইমাম উকাইলীর মন্তব্যের সার্থকতা বুঝাতে এবং যারা রাবীকে সরাসরি দুর্বল বলেছেন তাদের মন্তব্যের সংশোধনীস্বরূপ মন্তব্যটি করেছেন।

রাবী যখন কোনো হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন জানা যায় না; তখন সেই রাবীর ক্ষেত্রে বলা হয় 'তার হাদীছের মুতাবি' বা অনুগামী বর্ণনা পাওয়া যায় না'। কিন্তু অনেক সময় অনেক মযবূত রাবীর প্রায় হাদীছেই মুতাবি' বর্ণনা আছে। কিন্তু তিনি কিছু হাদীছ এমন বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করেননি; তখন তাকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাতার থেকে বের করে দেওয়া উচিত নয়। কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ কোনো হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করলে, উছূলে হাদীছের নীতিমালা অনুসারে সেই মুহাদ্দিছকে মোটেও দুর্বল বিবেচনা করা হয় না।

---

৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১/৮৭।
৫. আব্দুর রহমান বিন আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৮/৫৯।
৬. মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৮০৬৩।
৭. আব্দুর রহমান বিন আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৮/৫৯।
৮. বাশশার আওয়াদ, মাওসূয়া আক্বওয়ালি ইয়াহইয়া বিন মাঈন, রাবী নং ৩৫৫৭।
৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যাহ, রাবী নং ২৬৯।
১০. আবূ যুরআ' আর-রাযী, কিতাবুয যুআফা (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়), ২/৪২৫।
১১. ড. সাদী হাশেমী, আবূ যুরআ' ওয়া জুহূদুহু ফীস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২৯৪।
১২. আবূ জা'ফর উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর, রাবী নং ১৬৮২।
১৩. ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (দারুল কিতাব: বৈরূত), ১৩/৩৭৭।

৫. ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আত-তারীখুল কাবীরে মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ সম্পর্কে চুপ থেকেছেন।[১৪]

৬. ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহকে তার কিতাবুছ ছিক্বাত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৫] তথা রাবী তার নিকট নির্ভরযোগ্য।

৭. ইমাম দারাকুত্বনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী'।[১৬]

৮. ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ তাকে মযবূত বলেছেন।[১৭]

৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, صدوق يهم অর্থাৎ সত্যবাদী, কিন্তু ভুল করেন।[১৮]

সারমর্ম: ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনের মন্তব্যের যে ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হাতিম দিয়েছেন এবং ইমাম উকাইলীর মন্তব্যের যে ব্যাখ্যা ইমাম যাহাবী দিয়েছেন, তা সামনে রাখলে বুঝা যায়, রাবীর ন্যায়পরায়ণতাজনিত কোনো সমস্যা নেই। রাবী সত্যবাদী, কিন্তু হাদীছ বর্ণনায় মাঝে মাঝে ভুল করেন। তাই তো হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সত্যবাদী; কিন্তু ভুল করেন।

ফুলাইহ বিন সুলায়মান:

ইনি উপরে আলোচিত রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ-এর পিতা।

১. আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন।[১৯]

২. ইয়াহইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ২৩৩ হি.) বলেন, ضعيف الحديث 'যঈফুল হাদীছ' তথা দুর্বল।[২০]

তাহক্বীক্ব: ইমাম উকাইলী তার 'কিতাবুয-যুআফাউল কাবীর' গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন মাঈন থেকে আরও কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলোতেই ইয়াহইয়া বিন মাঈন এই রাবীকে দুর্বল বলেছেন।[২১] কিন্তু ইমাম ইবনু শাহীন তার 'তারীখ আসমাউছ ছিক্বাত' বইয়ে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন ফুলাইহকে ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[২২] যদিও এই ফুলাইহ দ্বারা কে উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট নয়। তবে ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি ইয়াহইয়া বিন মাঈন থেকে আরও একটি মন্তব্য পেশ করেছেন, যা রাবীর অবস্থাকে স্পষ্ট করে দেয়। ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, فليح صالح وليس حديثه بذاك الجائز অর্থাৎ ফুলাইহ সৎ; কিন্তু তার হাদীছ অতটা গ্রহণযোগ্য নয়।[২৩]

উল্লেখ্য, কিছু বইয়ে এই বাক্যের আরবী শব্দে ভুল রয়েছে। শেষ শব্দটি জাবের লেখা আছে, কিন্তু সঠিক হচ্ছে জায়েয।

৩. আলী বিন মাদিনী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) বলেন, كَانَ فليح وَأَخُوهُ عبد الحميد ضعيفين অর্থাৎ ফুলাইহ এবং তার ভাই আব্দুল হামিদ উভয়ই দুর্বল।[২৪]

৪. ইমাম যাকারিয়া আস-সাজী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) বলেন, يَهِمُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ অর্থাৎ তিনি ভুল করতেন, যদিও তিনি সত্যবাদী।[২৫]

৫. ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) তাঁর তারীখুল কাবীরে ফুলাইহ বিন সুলায়মান বিষয়ে চুপ থেকেছেন।[২৬]

৬. ইমাম মুসলিম ফুলাইহের বর্ণিত হাদীছকে গ্রহণ করেছেন।[২৭] তথা ফুলাইহ শুধু ইমাম বুখারীর নিকট নির্ভরযোগ্য তা নয়, বরং ইমাম মুসলিমের নিকটেও নির্ভরযোগ্য।

৭. আবূ যুরআ' আর-রাযী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেন, فليح بن سليمان ضعيف الحديث অর্থাৎ ফুলাইহ বিন সুলায়মান 'যঈফুল হাদীছ' বা দুর্বল।[২৮]

৮. ইমাম আবূ হাতিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেন, সে মযবূত নয়।[২৯]

৯. ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) ফুলাইহ বিন সুলায়মানের হাদীছকে তার ই'লালে হাসান বলেছেন।[৩০]

---

১৪. ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৬৫৭।
১৫. কিতাবুছ ছিক্বাত, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যাহ, রাবী নং ১০২৮২।
১৬. সুয়ালাত আল-হাকেম লিদ দারাকুত্বনী, রাবী নং ৪৬৫।
১৭. ইমাম যাহাবী, দিওয়ানুয যুআফা, রাবী নং ৩৯৩২; মান তুকুল্লিমা ফীহি, রাবী নং ৩১২।
১৮. আসক্বালানী, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২২৮।
১৯. ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ২৩/৩১৯।
২০. ইয়াহইয়া বিন মাঈন, সুয়ালাত ইবনুল জুনাইদ (মাকতাবাতুদ দার), রাবী নং ৮১৭, পৃ. ৪৭৩; তারীখ ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ১/৬৯।
২১. ইমাম উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর, রাবী নং ১৫২২।
২২. ইবনু শাহীন, তারীখ আসমাউছ ছিক্বাত (আদ-দার আস-সালাফিয়্যাহ), রাবী নং ১১৪২।
২৩. আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী, আত-তা'দীল ওয়াত তাজরীহ (দারুল লিওয়া: রিয়াদ), ৩/১০৫৪, রাবী নং ১২৩৪।
২৪. আলী বিন মাদিনী, সুয়ালাত ইবনু আবী শায়বা, রাবী নং ১৩৭।
২৫. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা।
২৬. আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৬০১।
২৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৮২, ২৭৭০, ২৪০, ৮৩৯।
২৮. যুআফা, আবূ যুরআ' (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়), ২/৩৬৭।
২৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, ৭/৮৫, রাবী নং ৪৭৯।

১০. ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেন, 'তিনি মযবূত নন'।[৩১]

ব্যাখ্যা: ইমাম নাসাঈ, আবূ যুরআ', আবূ হাতিম ও আলী বিন মাদিনী রাহিমাহুমুল্লাহ এই রাবীর বিষয়ে যে দুর্বলতা-বাচক শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলো হচ্ছে লায়সা বিল ক্বাবী, যঈফুল হাদীছ, যঈফ। এই শব্দগুলো ১ম স্তর ও ২য় স্তরের দুর্বলতা-বাচক শব্দ।[৩২] যা হালকা দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১১. ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) ফুলাইহ বিন সুলায়মানকে তার 'কিতাবুছ ছিক্বাত'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৩] তথা তার নিকটে রাবী মযবূত।

১২. ইমাম দারাকুত্বনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لا بَأْسَ بِهِ অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।[৩৪] অন্যত্র তিনি ছিক্বাহ বা মযবূত বলেছেন।[৩৫]

১৩. ইমাম ইবনু আদী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) ফুলাইহ সম্পর্কে দুর্বলতা নির্দেশক মন্তব্যগুলো বর্ণনা করার পর তার আল-কামিল গ্রন্থে বলেন,

ولفليح أحاديث صالحة يرويها يروي عن نافع عنِ ابن عُمَر نسخة ويروي عن هلال بن علي عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عمرة عَن أَبِي هريرة أحاديث ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة مثل أَبِي النضر وغيره أحاديث مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البُخارِيّ فِي صحيحه وَهو عندي لا بأس به.

অর্থাৎ ফুলাইহ এর অনেক সঠিক হাদীছ রয়েছে, যা তিনি নাফে' থেকে, তিনি ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-থেকে কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হিলাল বিন আলী থেকে, তিনি আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি মদীনার অন্যান্য শায়খগণ যেমন: আবুন নাযর ও অন্যদের থেকে বেশ কিছু সঠিক ও দুর্লভ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাকে ছহীহ বুখারীর জন্য নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। আর তার বিষয়ে আমার মন্তব্য হচ্ছে, তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই'।[৩৬]

১৪. ইমাম হাকেম বলেন, اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ-এর তার বিষয়ে একমত হওয়া তার বিষয়টিকে শক্তিশালী করে।[৩৭]

১৫. ইমাম যাহাবী বলেন, الحَافِظُ أَحَدُ أَئِمَّةِ الأَثَرِ অর্থাৎ হাফেয হাদীছের একজন বড় ইমাম।[৩৮] ইমাম যাহাবী আরও বলেন, كان ثقة مشهوداً كثير العلم لينه ابن معين অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য, তার পক্ষে অনেকেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাকে ইবনু মাঈন হালকা দুর্বল বলেছেন।[৩৯] তিনি আরও বলেন, وكان صادقا عالما صاحب حديث وما هو بالمتين অর্থাৎ তিনি সত্যবাদী ছিলেন, হাদীছের বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন, হাদীছ বর্ণনাকরী ছিলেন, তবে তিনি স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে মযবূত নন।[৪০] তিনি আরও বলেন, وَلَيْسَ فُلَيْحٌ فِي الْإِتْقَانِ كَمَالِكٍ وَلَا هُوَ فِي اللِّينِ كَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى অর্থাৎ ফুলাইহ মযবূত হওয়ার দিক দিয়ে ইমাম মালেকের মতো নয় এবং দুর্বল হওয়ার দিক দিয়ে ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়ার মতো নয়।[৪১]

ব্যাখ্যা: ইমাম মালেকের বিষয়ে একটি বক্তব্যই যথেষ্ট, তিনি হিফযের পাহাড়। ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়াকে মুহাদ্দিছগণ মাতরূক বা পরিত্যক্ত বলেছেন।[৪২] যা চতুর্থ স্তরের দুর্বলতা-বাচক শব্দ, যা কঠিন দুর্বলতা নির্দেশ করে। অতএব, ইমাম যাহাবীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট ফুলাইহ হালকা দুর্বল।

ইমাম যাহাবী আরও বলেন, حَدِيثُهُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ وَأَشْرَاطِهِ অর্থাৎ ফুলাইহের হাদীছ, ছহীহ হাদীছের শর্ত ও প্রকারসমূহ হতে ২য় পর্যায়ের হাদীছ।[৪৩] তিনি আরও বলেন, كَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ অর্থাৎ তিনি তৎকালীন যুগের অন্যতম বড় আলেম ছিলেন। তিনি আরও বলেন, وَغَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ অর্থাৎ অন্যরা তার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।[৪৪]

---

৩০. ইমাম তিরমিযী, আল-ই'লালুল কাবীর (মাকতাবাতুন নাহযা: বৈরূত), পৃ. ৩৬, হা/২৫।

৩১. ইমাম নাসাঈ, আয-যুআফা ওয়াল মাতরূকীন, রাবী নং ৪৮৬।

৩২. ড. আব্দুল আযীয, যওয়াবেতুল জারহ ওয়াত তা'দীল, পৃ. ২২৫।

৩৩. কিতাবুছ ছিক্বাত, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যাহ, রাবী নং ১০৮৮২।

৩৪. ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (দারুল কিতাব: বৈরূত), ১০/৩৯৯; মীযানুল ই'তিদাল, ৩/৩৬৬।

৩৫. ইমাম দারাকুত্বনী, আয-যুআফা ওয়াল মাতরূকীন, রাবী নং ৩৪৮।

৩৬. ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল, ৭/১৪৪, রাবী নং ১৫৭৫।

৩৭. আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৮/৩০৪।

৩৮. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা।

৩৯. ইমাম যাহাবী, আল-ইবারু ফী খাবারি মান গবার (দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ), ১/১৯৬।

৪০. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৬৪।

৪১. ইমাম যাহাবী, আল-মু'জামুল মুখতাস (মাকতাবাতুছ ছিদ্দীক: তায়েফ), 'হারফুল আলিফ' অধ্যায়, পৃ. ৮।

৪২. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৪১।

৪৩. ইমাম যাহাবী, আল-মু'জামুল মুখতাস (মাকতাবাতুছ ছিদ্দীক: তায়েফ), 'হারফুল আলিফ' অধ্যায়, পৃ. ৮।

৪৪. ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (দারুল কিতাব: বৈরূত), ১০/৩৯৭, রাবী নং ৩২২।

এই মন্তব্যটি ১ম স্তরের দুর্বলতা-বাচক শব্দ, যা অত্যন্ত হালকা দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।[৪৫]

১৬. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, صدوق كثير الخطأ। অর্থাৎ সত্যবাদী, কিন্তু অত্যধিক ভুলকারী।[৪৬]

তাহক্বীক্ব: মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় উস্তায মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী হাফিযাহুল্লাহ আমাদের দারসে বলেন, এই রাবীর উপর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর এই মন্তব্য গবেষণার মুখাপেক্ষী। তার ধারণা এই রাবী অত্যধিক নয়; বরং অল্প ভুল করেন।[৪৭]

১৭. ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه অর্থাৎ ফুলাইহ বিন সুলায়মান তার ভিতরে স্মৃতিশক্তিগত দুর্বলতা রয়েছে।[৪৮] অন্যত্র তিনি বলেছেন, فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু অত্যধিক ভুল করেন।[৪৯] তিনি আরও বলেন, فلا ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم يتفرد به অর্থাৎ মূল হাদীছের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না, যতক্ষণ তিনি হাদীছটি বর্ণনা না করবেন।[৫০]

আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর মন্তব্যগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাবীর দুর্বলতা স্মৃতিশক্তিজনিত। আর তার হাদীছ তখনই গ্রহণ করা হবে না, যখন তিনি হাদীছটি বর্ণনায় একা হবেন তথা তার কোনো মুতাবাআত বা শাওয়াহেদ থাকবে না।

সারমর্ম: ইমাম ইবনু আদীর মন্তব্যকে সামনে রাখলে রাবীর অবস্থা স্পষ্ট হয়। রাবীর ন্যায়পরায়ণতাজনিত কোনো ত্রুটি নেই। রাবী সত্যবাদী ও সৎ, কিন্তু তিনি কিছু হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছেন। যার কারণে অনেকেই তাকে দুর্বল বলেছেন।

(৪) হিলাল বিন আলী: সকল ইমামের নিকট তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবী।[৫১]

(৫) আত্বা বিন ইয়াসার: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(৬) আবূ হুরায়রা: তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

সনদের সূক্ষ্মতা:

১. দ্বিতীয় সনদের সকল রাবী মদীনার অধিবাসী।

২. ح (হা)-শব্দটি তাহবীল বা সনদ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাহবীল কী ও কেন?

এক সনদ থেকে আরেক সনদের দিকে যাওয়ার জন্য মধ্যখানে (ح) হা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যার দ্বারা তাহবীল (تحويل) উদ্দেশ্য। মূল মাদ্দাহ ح-و-ل থেকে বাবে তাফঈল-এর মাছদার হচ্ছে তাহবীল (تحويل)। যার শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করা। তাহবীলের পরিবর্তে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হা (ح) ব্যবহার করা হয়। হাদীছ পড়ার সময় উক্ত হা (ح)-এর জায়গায় তাহবীল পুরোটাই উচ্চারণ করা যায় অথবা শুধু (حاء) হাউন তানবীনসহ পুরো বর্ণ উচ্চারণ করা যায়। তবে বর্তমানে হাদীছ পড়ার সময় যেটা প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে শুধু হা (ح) উচ্চারণ করা। শুধু হা (ح) উচ্চারণ শুনলেই ছাত্ররা বুঝে ফেলে যে, এখানে সনদ পরিবর্তন হচ্ছে। তবে হা (ح) উচ্চারণের পরপরই সবসময় একটা শব্দ অতিরিক্ত করা উচিত আর তা হচ্ছে 'ওয়া বিহি ক্বলা' (وبه قال)। তথা একত্রে হা (ح وبه قال حدثنا) 'ওয়া বিহি ক্বলা হাদ্দাছানা'। এখানে 'ওয়া বিহি' দ্বারা আমরা যে সনদে মূল লেখক তথা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই সনদ উদ্দেশ্য। আর 'ক্বলা' (قال) দ্বারা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ হা (ح) দ্বারা হায়েল (حائل) উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যার অর্থ হচ্ছে দুটি বিষয়ের মাঝে আড় সৃষ্টি করা। তথা এখানে দুটি সনদ যেন একত্রিত না হয়ে যায় এই জন্য হা (ح) দেওয়া হয়েছে। যারা হা (ح) দ্বারা হায়েল উদ্দেশ্য নিয়েছেন তারা হাদীছ পড়ার সময় এখানে কোনো কিছু উচ্চারণের কথা বলেননি, বরং তাদের মতে এখানে চুপ থাকতে হবে।

পশ্চিমা বা স্পেনের উলামায়ে কেরাম হা (ح) দ্বারা হাদীছ উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন এবং হা-এর জায়গায় সবসময় হাদীছ পড়ে থাকেন তারা।

কেউ কেউ এখানে হা-এর পরিবর্তে (صح) 'ছহ' ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে সঠিক। তথা কেউ যেন মনে না করে যে, এখানে কোনো সমস্যা আছে বা কোনো রাবী বা শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে; বরং যেভাবে আছে সেভাবেই বিশুদ্ধ আছে।[৫২]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৪৫. ড. আব্দুল আযীয, যওয়াবেতুল জারহ ওয়াত তা'দীল, পৃ. ২২৫।
৪৬. আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৪৪৩।
৪৭. মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী, মুযাক্কিরা সুনানি আবী দাঊদ, খিদমাতুত ত্বলিব, পৃ. ১৩।
৪৮. ইমাম আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৬, হা/৩০৯।
৪৯. ইমাম আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৬/৩৩৩।
৫০. সিলসিলা ছহীহা, হা/৪৭৮।
৫১. তাহযীবুল কামাল, ৩০/৩৪৩।
৫২. তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৩১।

ঈদের মাসায়েল

*-আল-ইতিছাম ডেস্ক**

ভূমিকা:

‘ঈদ’ (عيد) শব্দটি আরবী, যা ‘আউদুন’ (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[১] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[২] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ‘ঈদ’ বলা হয়।[৩]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈদুল ফিত্বর’-এর সূচনা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু’দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দু’দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং ‘ঈদুল ফিত্বর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন— ‘ঈদুল আযহা’ ও ‘ঈদুল ফিত্বর’।[৫]

ঈদের ছালাতের আগে করণীয়:

(১) ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক ছা‘ (প্রায় ২.৫০ কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা হিসাবে আদায় করা ফরয।[৬] উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৭] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুমতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবল খুৎবা শ্রবণ এবং দু‘আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৮] এখানে দু‘আ বলতে সম্মিলিত দু‘আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আমল।[৯]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[১০]

ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়ম:

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন।[১২] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ:

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।[১৩]

---

১. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।

৩. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।

৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।

৫. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।

৯. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।

১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।

১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।

১২. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।

১৩. আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।

উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১৪]

ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল:

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমানিক ১৫ মিনিটি পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাক। এটাই জমহূর আলেমের মত।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১৬]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১৭] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে ছালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবল মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।[১৮] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাতবিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১৯] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীআতসম্মত নয়।[২১] ঈদের ছালাতের খুৎবা একটি।[২২] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছসম্মত।

(৫) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[২৩] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদায় করেননি।[২৪]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[২৫]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!'[২৬]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাতে দান করলেন।[২৭]

ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা:

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا 'ঈদুল ফিত্বর-এর প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[২৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া) প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২৯] ইবনু উমার

---

১৪. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।
১৫. ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।
১৬. যাদুল মা'আদ।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।
১৮. আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।
২০. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।
২২. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।
২৩. ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।
২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।
২৫. ছহীহ বুখারী, ২/২৩।
২৬. তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।
২৭. ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।
২৮. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।
২৯. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।

রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই ঈদের তাকবীর হবে— প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ'।[৩০] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৩১]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।[৩২] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৩] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী রাহিমাহুমাল্লাহ একে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৫]

ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়ম:

ঈদের ছালাত দু'রাকআত।[৩৬] নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[৩৭] অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[৩৮] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-ক্বামার পড়তেন।[৩৯] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[৪০]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩০. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
৩১. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।
৩২. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।
৩৩. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।
৩৪. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
৩৫. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।
৩৬. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।
৩৭. ইবনু খুযায়মা।
৩৮. যাদুল মা'আদ, ১/৪৪১।
৩৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।
৪০. যাদুল মা'আদ, ১/৪২৯।

শাওয়ালের ছিয়াম রাখার আগে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা কি আবশ্যক?

*-আব্দুল্লাহ মাহমুদ**

শাওয়াল মাসের অন্যতম মাসনূন আমল হচ্ছে— ৬ দিন ছিয়াম রাখা। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়ামের পর শাওয়ালের ৬ দিন ছিয়াম রাখবে, তার সারা বছর ছিয়াম রাখা হবে'।[১]

সারা বছর ছিয়াম রাখার হিসাব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ভালো আমলকে ১০ গুণ বৃদ্ধি করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ 'যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে, তার জন্য রয়েছে ১০ গুণ' *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*।

সেই হিসাবে রামাযান মাসের ৩০ ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে (৩০×১০=৩০০) হয় ৩০০ দিন। আর শাওয়ালের ৬ ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে (৬×১০=৬০) হয় ৬০ দিন। অতএব, সর্বমোট দিন হয় ৩৬০। আর আরবী বছর হয় ৩৬০ দিনে। এভাবে শাওয়াল মাসের ৬ দিন ছিয়াম রাখলে সারা বছর ছিয়াম রাখা হয়।

উপর্যুক্ত হিসাব সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও জানিয়ে দিয়েছেন। চলুন সরাসরি তার মুখ থেকে সেই হিসাব শুনি। তিনি বলেন, مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ৬ দিন ছিয়াম রাখল, তা পূর্ণ বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য। কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার ১০ গুণ পাবে'।[২] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ السَّنَةِ 'রামাযানের এক মাস ছিয়াম ১০ মাস ছিয়ামের সমান এবং রামাযানের পর ৬ দিন ছিয়াম দুই মাস ছিয়ামের সমান। এভাবে (রামাযানের পুরো মাস ও শাওয়ালের ৬ দিন ছিয়াম) এক বছর ছিয়ামের সমান হয়'।[৩]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কারো যদি রামাযানের ছিয়াম বাকি থাকে, তাহলে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম রাখার আগে তাকে রামাযানের বাকি ছিয়াম রাখতে হবে, না-কি শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম রেখে বছরের যেকোনো সময় রামাযানের বাকি ছিয়াম রাখবে—এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের তিন মাযহাব তথা হানাফী, মালেকী ও শাফেঈ মাযহাব মতে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পূর্বে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম রাখা যাবে। আর হাম্বলী মাযহাব মতে প্রথমে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে, এরপর শাওয়ালের ছিয়াম রাখতে হবে। তাদের মতে, রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পূর্বে শাওয়ালের ছিয়াম রাখা বৈধ নয়। এমনকি কেউ কেউ তা বিদআত বলেছেন।[৪]

তবে এ কথা প্রায় সবাই বলেছেন যে, যদি ক্বাযা ছিয়ামের পরিমাণ কম হয় আর শাওয়ালের ছিয়ামের পূর্বে তা আদায় করা সহজ হয়, তাহলে প্রথমে ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পর শাওয়ালের ছিয়াম আদায় করা ভালো।

কিন্তু কেউ যদি বিনা কারণে ক্বাযা ছিয়াম প্রথমে আদায় না করে বা কোনো কারণবশত আদায় করতে না পারে, তাহলে তার ক্ষেত্রে তিন মাযহাবের মত সঠিক। অর্থাৎ রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পূর্বে শাওয়ালের ছিয়াম রাখা বৈধ। কারণ, রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় না করলে শাওয়ালের ছিয়াম রাখা যাবে না—এ মর্মে কুরআন ও হাদীছে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তাছাড়া ফরয ছিয়ামের পূর্বে নফল ছিয়াম রাখা যাবে না—এমন কোনো কথাও কিতাব ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না।

যারা বলেন রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় না করার পূর্বে শাওয়ালের ছিয়াম রাখা যাবে না, তাদের দলীল ও আপত্তিগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে তাদের দলীল ও আপত্তিগুলোর জবাবও প্রদত্ত হলো।

প্রথম আপত্তি: কেউ কেউ বলেন, শাওয়ালের ছিয়াম তিনি রাখতে পারবেন, যিনি রামাযান মাসেই রামাযানের পূর্ণ ছিয়াম আদায় করবেন। কারণ, হাদীছে বলা হয়েছে, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়ামের পর শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখবে, তার সারা বছর ছিয়াম রাখা হবে'।[৫]

অতএব, যে ব্যক্তি রামাযান মাসে রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করেনি, তার ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, সে রামাযানের ছিয়াম রেখেছে; বরং সে তো রামাযানের আংশিক ছিয়াম রেখেছে।[৬]

জবাব: (ক) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৮; তিরমিযী, হা/৭৫৯।
২. ইবনু মাজাহ, হা/১৭১৫, হাদীছ ছহীহ।
৩. সুনানুন কুবরা লিন নাসাঈ, হা/২৮৭৩, হাদীছ ছহীহ।
৪. আল-বুরহানুল মুবীন ফিত তাসাদ্দী লিল বিদা ওয়াল আবাতীল, ১/৫২৭।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৮; তিরমিযী, হা/৭৫৯।
৬. শারহু যাদিল মুস্তাকনী, ৩/১৫।

‘যাতে তোমরা (রামাযানের ছিয়ামের) সংখ্যা পূরণ করতে পারো এবং আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের কারণে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে পারো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এই আয়াতের আলোকে আলেমগণ বলেন যে, রামাযান মাস শেষ হলে ঈদুল ফিতরের তাকবীর দেওয়া শুরু করতে হবে।

আয়াতের দিকে লক্ষ করুন, আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করার পর তোমরা তাকবীর দাও। অথচ কেউ বলেন না যে, ঈদের তাকবীর শুধু সে দেবে, যে রামাযান মাসে ছিয়াম পূর্ণ করেছে; যার কোনো কারণবশত বা বিনা কারণে ছিয়াম ছুটে গেছে, সে তাকবীর দিতে পারবে না। তারা এ আয়াতের যে জবাব দেবেন, সে জবাব শাওয়ালের ছিয়ামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মূলত আয়াতে ছিয়াম পূর্ণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য, সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী ছিয়াম রাখা। অনুরূপ হাদীছে বর্ণিত রামাযানের ছিয়াম রাখা দ্বারাও একই উদ্দেশ্য।

(খ) এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম রাখবে ঈমান-সহ নেকীর আশায়, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়’।[৭]

শাওয়ালের ছিয়ামের ক্ষেত্রে হাদীছে যে শব্দ উল্লেখ রয়েছে, একই শব্দ এই হাদীছেও রয়েছে। তাদের কথামতো শুধু তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যে রামাযান মাসে পূর্ণ ছিয়াম রাখবে। আর যে ব্যক্তি কারণবশত পূর্ণ ছিয়াম রাখতে পারবে না, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে না। অথচ একথা কেউ বলবে না। অতএব, তারা এ হাদীছের যে জবাব দেবেন, সে জবাব শাওয়ালের ছিয়ামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় আপত্তি: শাওয়ালের ছিয়াম শুধু সেই রাখতে পারবে, যে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করবে। কেউ শাওয়ালের ছিয়াম ততক্ষণ রাখতে পারবে না, যতক্ষণ না সে রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম আদায় করে। কারণ, যে হাদীছে শাওয়ালের ছিয়ামের কথা বলা হয়েছে, সে হাদীছে প্রথমে রামাযানের ছিয়ামের কথা বলা হয়েছে এরপর ثُمَّ أَتْبَعَهُ তথা ‘রামাযানের ছিয়ামের পর’ শাওয়ালের ছিয়ামের কথা বলা হয়েছে।

জবাব: (ক) তাদের এ আপত্তির জবাবে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মুখতার শানকীতী বলেন,

ثُمَّ نَقُوْلُ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ لَمْ يَشْمُلِ الْحَدِيْثُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ قَضَى فِيْ شَوَّالَ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَامَ رَمَضَانَ حَقِيْقَةً؛ وَإِنَّمَا صَامَ قَضَاءً وَلَمْ يَصُمْ أَدَاءً.

‘তার জবাবে আমরা বলব, তারা যে আপত্তির কথা ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক হলে, সে ব্যক্তিও শাওয়ালের ছিয়াম রাখতে পারবে না, যে রামাযানের একটি ছিয়াম ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, সে ব্যক্তি উক্ত ছুটে যাওয়া ছিয়াম শাওয়াল মাসে ক্বাযা করলেও তার ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, সে রামাযানের ছিয়াম রেখেছে। বরং সে তো ক্বাযা ছিয়াম আদায় করেছে; ছিয়াম আদায় করেনি’।[৮]

অতএব, তারা এ আপত্তির যে জবাব দেবেন, একই জবাব তাদের আপত্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(খ) কোনো কোনো বর্ণনায় ثُمَّ أَتْبَعَهُ তথা ‘রামাযানের ছিয়ামের পর’ বাক্য থাকলেও কোনো বর্ণনায় بَعْدَ الْفِطْرِ তথা ‘রামাযান শেষে’ বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, রামাযান মাস শেষ হলে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা ছাড়া শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম রাখা যাবে।

(গ) কোনো কোনো বর্ণনায় রামাযানের ছিয়ামের পর শাওয়ালের ছিয়াম রাখতে হবে—এমন কোনো ধারাবাহিকতার কথা বলা হয়নি। যেমন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ.

‘যে ব্যক্তি রামাযানের ও শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম রাখবে সে গোটা বছর ছিয়াম রাখবে’।[৯]

صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ السَّنَةِ.

‘রামাযানের এক মাস ছিয়াম দশ মাস ছিয়ামের সমান এবং রামাযানের পর ছয় দিন ছিয়াম দুই মাস ছিয়ামের সমান। এভাবে (রামাযানের সব ছিয়াম ও শাওয়ালের ছয় দিন ছিয়াম) এক বছর ছিয়ামের সমান হয়’।[১০]

উপর্যুক্ত দুই হাদীছে রামাযানের ছিয়ামের পর শাওয়ালের ছিয়াম রাখতে হবে এমন কোনো কথা বলা হয়নি- যা থেকে প্রমাণ হয়, রামাযানের পর শাওয়াল এমন ধারাবাহিকতা মূল উদ্দেশ্য নয়; মূল উদ্দেশ্য রামাযান মাসের ছিয়াম রাখা এবং শাওয়ালের ছিয়াম রাখা।

তৃতীয় আপত্তি: ফরয ছিয়ামের পূর্বে যেকোনো ধরনের নফল ছিয়াম রাখা যাবে না। কারণ, নফল ছিয়াম আদায় করা ছাড়া কেউ মারা গেলে তাকে পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু ফরয ছিয়াম আদায় করা ছাড়া কেউ মারা গেলে তাকে পাকড়াও করা হবে।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮।

৮. শারহু যাদিল মুস্তাকনী, ১১/২১।

৯. মুসনাদ আহমাদ, হা/২৩৫৫৬, হাদীছটি গ্রহণযোগ্য।

১০. সুনানুন কুবরা লিন নাসাঈ, হা/২৮৭৩, হাদীছ ছহীহ।

জবাব: (ক) তারা তাদের মতের পক্ষে নিম্নের হাদীছটি দলীল হিসেবে পেশ করেন:

وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ.

'যে ব্যক্তি নফল ছিয়াম রাখে আর তার ওপর রামাযানের কোনো ছিয়াম থাকে অথচ তা ক্বাযা আদায় করেনি, তার নফল ছিয়াম কবুল করা হবে না, যতক্ষণ না ক্বাযা ছিয়াম রাখে'।[১১]

এ হাদীছ দুর্বল। কারণ, এর সনদে ইবনু লাহিয়্যাহ নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাছাড়া হাদীছের শব্দে ইযত্বিরাব বা বিশৃঙ্খলা রয়েছে।

এ ব্যাপারে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি উক্তিও পেশ করা হয়। উক্তিটি হলো— وَأَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ 'ফরয আদায় করা পর্যন্ত নফল কবুল করা হয় না'।[১২] আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ আছারটি দুর্বল। কারণ, সনদে ইনক্বিতা বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এ ছাড়া দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি আছার তথা উক্তিও উল্লেখ করা হয়। আছারটি হলো—

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ أَفَأَصُوْمُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا قَالَ لَا وَلِمَ إِبْدَأْ بِحَقِّ اللهِ ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَ مَا شِئْتَ.

আবূ হুরায়রাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, আমার রামাযানের কিছু ছিয়াম ক্বাযা আছে। এমতাবস্থায় আমি কি যিলহজ্জ মাসের ১০ দিনের নফল ছিয়াম রাখব? তিনি বললেন, না। কেন এমন করবে? আল্লাহর হক্ব প্রথমে আদায় করো, এরপর তোমার ইচ্ছামতো নফল ছিয়াম রাখো।[১৩]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ফরযের পূর্বে নফল ছিয়াম রাখার পক্ষে ছিলেন না। সম্ভাবনা আছে, তিনি নফল ছিয়ামের পূর্বে ফরয ছিয়াম পূর্ণ করাকে উত্তম মনে করতেন। কারণ, তিনি হারাম মনে করলে তাকে বলে দিতেন, ফরযের পূর্বে নফল ছিয়াম রাখা হারাম। তা না বলে তিনি তাকে বলেন, আল্লাহর হক্ব প্রথমে আদায় করো, এরপর তোমার ইচ্ছামতো নফল ছিয়াম রাখো।

ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী এ ধরনের কথা উল্লেখ করার পর বলেন, وَظَاهِرُ قَوْلِهِ جَوَازُ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَصُوْمَ الدَّيْنَ أَوَّلًا 'তার কথা থেকে বোঝা যায়, যার ওপর রামাযানের ছিয়াম ক্বাযা আছে, তার জন্য নফল ছিয়াম রাখা বৈধ। তবে প্রথমে ক্বাযা আদায় করে নেওয়া উত্তম'।[১৪]

ইবনু হাজার আসক্বালানী যে কথা বলেছেন, তা আরও শক্তিশালী হয় স্বয়ং আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আরেকটি আছার থেকে। তিনি বলেন, اِبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ لاَ بَأْسَ أَنْ تَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ 'তুমি ফরয দিয়ে শুরু করো। যিলহজ্জ মাসের ১০ দিনে তা পালন করতে কোনো সমস্যা নেই'।[১৫]

(খ) উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো কারণ ছাড়াই শা'বান মাস পর্যন্ত ক্বাযা ছিয়াম আদায়ে বিলম্ব করা যাবে।[১৬]

যদি বিনা কারণে শা'বান মাস পর্যন্ত ক্বাযা ছিয়াম বিলম্ব করা বৈধ হয়, তাহলে শাওয়ালের ছিয়ামের কারণে বিলম্ব করা কেন বৈধ হবে না? কেউ শাওয়ালের ছিয়ামের কারণে বিলম্ব করলে তাতে দোষ ও সমস্যা কী?! কী বিস্ময়কর কথা যে, বিনা কারণে শা'বান পর্যন্ত ক্বাযা আদায়ে বিলম্ব করা হালাল কিন্তু শাওয়ালের ছিয়ামের কারণে বিলম্ব করা হারাম! কেউ যদি শাওয়ালের ছিয়াম রাখার কারণে ক্বাযা ছিয়াম শা'বান মাস পর্যন্ত বিলম্বে করে এবং ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবে; অপরপক্ষে কেউ যদি বিনা কারণে ক্বাযা ছিয়াম শা'বান মাস পর্যন্ত বিলম্বে করে এবং ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পূর্বে মারা যায়, তবে তাকে পাকড়াও করা হবে না—এমন কথাও কি চরম উদ্ভূত নয়?

শায়খ হামাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয হামাদ বলেন,

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : اَلرَّجُلُ يُؤَخِّرُ الصَّوْمَ مِنْ رَمَضَانَ، يُرِيْدُ أَن يُؤَخِّرُ قُبَيْلَ رَمَضَانَ اَلآخَرِ، فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ لَهُ وَالْقَضَاءُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ وَقْتٌ مُوَسَّعٌ، فَالْفَضِيْلَةُ فِي الْاِسْتِعْجَالِ بِذَلِكَ، وَلَكِنِ الْجَوَازُ وَقْتُهُ مُوَسَّعٌ، فَإِذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ - حَيْثُ يَجُوْزُ لَهُ - فَمَاتَ قَبْلَ أَن يَّقْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ.

শায়খুল ইসলাম বলেছেন, কেউ যদি এ নিয়্যতে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায়ে বিলম্ব করে যে, সামনের রামাযানের কিছুদিন পূর্বে ক্বাযা আদায় করে নেবে, তবে তা জায়েয। কারণ, এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান পর্যন্ত যেকোনো সময় তার জন্য ক্বাযা আদায় করা জায়েয। তবে তাড়াতাড়ি আদায় করে নেওয়া উত্তম। কিন্তু আরেক রামাযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয। অতএব, কেউ যদি জায়েযের ভিত্তিতে বিলম্ব করে এবং ক্বাযা আদায়ের পূর্বেই মারা যায়, তাহলে ইজমা অনুযায়ী সে পাপী হবে না।[১৭]

---

১১. মুসনাদ আহমাদ, হা/৮৬২১।
১২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/৩৫৫৭৪।
১৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৭৭১৫, আছারটি ছহীহ।
১৪. ফাতহুল বারী, ৪/১৪৯।
১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/৯৬১০, আছারটি ছহীহ।
১৬. আল-ফুরূ ওয়া তাসহীহুল ফুরূ, ৫/৬২।
১৭. শারহু যাদিল মুস্তাকনী লিল হামদ, ৩/১৮।

(গ) নফলের পূর্বে ফরয আদায়ের তাকিদ তখন দিতে হবে, যখন সময় এত সংকীর্ণ হবে যে, ফরয ও নফলের যেকোনো একটা আদায় সম্ভব হবে। ফরয আদায় করলে নফল আদায়ের সময় হবে না অথবা নফল আদায় করলে ফরয আদায়ের সময় হবে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই নফলের পূর্বে ফরয আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি সময় এত প্রশস্ত হয় যে, ফরয ও নফল দুটোই আদায় করা যাবে, তখন ফরযের পূর্বে নফল আদায়ে কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে ফরযের পূর্বে নফল আদায়ের শিক্ষা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। যেমন যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করতে তিনি ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন। একই কথা রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায়ের পূর্বে শাওয়ালের ছিয়াম রাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান পর্যন্ত যেহেতু ক্বাযা আদায়ের সময়, তাই ক্বাযা আদায় না করে এর মাঝে যেকোনো নফল ছিয়াম আদায় করা জায়েয। এ কারণে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা শা'বান পর্যন্ত ক্বাযা ছিয়াম আদায়ে বিলম্ব করতেন।[১৮]

আর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা গোটা বছরে কোনো নফল ছিয়াম রাখতেন না, তা হতেই পারে না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

لِأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْضِيْ رَمَضَانَ فِيْ شَعْبَانَ، وَيَبْعُدُ أَن لَّا تَكُوْنَ تَطَوَّعَتْ بِيَوْمٍ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَصُوْمُ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءَ، وَكَانَ يُكْثِرُ صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، وَكَانَ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

আয়েশা জানাচ্ছেন, তিনি শা'বান মাসে রামাযানের ক্বাযা আদায় করতেন। আর এটা হতেই পারে না যে, তিনি এর মাঝে একদিনও নফল ছিয়াম রাখতেন না। অথচ নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমনভাবে ছিয়াম রাখতেন যে, বলা হতো তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না, আবার এমনভাবে ছিয়াম ছাড়া শুরু করতেন যে, বলা হতো তিনি আর ছিয়াম রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরাফা ও আশূরার ছিয়াম রাখতেন, বেশি বেশি সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম রাখতেন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতেন।[১৯]

বরং আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা শা'বানের পূর্বে নফল ছিয়াম রাখতেন তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তিনি বলেন, مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিনের তুলনায় বছরে এমন কোনো দিন নেই, যেদিন ছিয়াম রাখা আমার কাছে বেশি প্রিয়'।[২০]

ইবনু শিহাব যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ ﷺ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ 'নবী-পত্নী আয়েশা ও হাফছা দুজন নফল ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন। উভয়ের কাছে খাবার হাদিয়া দেওয়া হয়। তারা সেই খাবার খেয়ে ইফতার করেন'।[২১]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তিনি ক্বাযা আদায়ের পূর্বে নফল ছিয়াম রাখতেন অথচ তিনি তাতে বাধা দেননি। অতএব, প্রমাণিত হয়- ক্বাযা ছিয়াম আদায়ের পূর্বে নফল ছিয়াম রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করার পূর্বেই শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

---

১৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০।

১৯. শারহুল উমদাহ লি-ইবনে তায়মিয়া, 'কিতাবুছ ছিয়াম', ১/৩৫৮।

২০. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/৯৮০৯, আছারটি ছহীহ।

২১. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১০৮৪।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য জিনিস
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

খাবার গ্রহণের নববী তরীকা

*-আব্দুল্লাহ আল-আমিন**

মুমিনের সকল কাজ হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পদ্ধতিতে। খাদ্য গ্রহণ করা সকল প্রাণির জন্য অত্যাবশ্যক। আমাদের জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এই খাদ্য। ইসলামে খাদ্য গ্রহণ করার একটি পুরোপুরি ধারণা পাওয়া যায়। অতএব, একজন মুমিনকে অবশ্যই ইসলামের দেখানো পথ অনুযায়ী আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত এই খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। সুপ্রিয় পাঠক! বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা খাদ্য গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

(১) আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার খাওয়া: আমাদেরকে সবসময় আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) খাবার গ্রহণ করতে হবে। কারণ যে খাবারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, তাতে শয়তান অংশগ্রহণ করে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 'শয়তান সে খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ বলা হয় না'।[১]

শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই পড়তে হবে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ'। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোনো খাবার খাবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে কেউ তা বলতে ভুলে গেলে সে যেন (মনে পড়লে) বলে, بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহূ ওয়া আখেরাহূ'।[২]

(২) ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ করা: আমাদেরকে ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। কারণ বাম হাতে শয়তান খাবার গ্রহণ করে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا 'অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে'।[৩]

(৩) নিজের কাছের দিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করা: খাবারের প্লেট সামনে নেওয়ার পর কোলের দিক থেকে তথা নিজের কাছের দিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করা ইসলামের সৌন্দর্য। উমার ইবনু আবী সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় আমি একজন ছোট বালক ছিলাম। সেসময় খাদ্য গ্রহণের সময় আমার হাত খাদ্যের পাত্রের এদিক-সেদিক যেত। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, 'হে বৎস! তুমি আল্লাহর নামে খাও, ডান হাতে খাও এবং তোমার তোমার নিকট থেকে খাবার গ্রহণ করো'।[৪]

(৪) মাঝখান থেকে না খাওয়া: থালার মাঝখান থেকে খাদ্য গ্রহণ না করার ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ আছে। কারণ খাবারের মধ্যখানে বরকত নাযিল হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ 'খাদ্যের মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়। সুতরাং তোমরা পার্শ্ব থেকে খাবে; মধ্যস্থল থেকে খাবে না'।[৫]

(৫) তিন আঙুলের সাহায্যে খাওয়া: নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ সময় রুটি খেতেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন আঙুলে (বৃদ্ধাঙুল, তর্জনী ও মধ্যমা) খেতেন। ইবনু কা'ব ইবনে মালেক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন আঙুল দ্বারা খেতেন।[৬]

(৬) পড়ে যাওয়া লোকমা বা খাবার তুলে খাওয়া: পড়ে যাওয়া খাদ্য তুলে খাওয়া সুন্নাত। এতে দোষের কিছু নেই। বরং তা মুছে বা পরিষ্কার করে খেতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ 'শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজের সময় তোমাদের পাশে উপস্থিত হয়, এমনকি তার খাবার খাওয়ার সময়ও তার পাশে উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা মাটিতে পড়ে যায়, সে যেন তাতে লেগে যাওয়া ময়লা অপসারণ করে তা খেয়ে নেয় এবং এটা শয়তানের জন্য যেন ফেলে না রাখে। অতঃপর যখন খাবার গ্রহণ শেষ করবে, তখন সে যেন তার আঙুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে'।[৭]

অনুরূপভাবে যদি পানীয়তে মাছি পড়ে যায়, তাহলে সেটিকে সরাসরি না তুলে পূর্ণরূপে তাতে ডুবিয়ে, অতঃপর তা তুলে ফেলে পান করা কর্তব্য। কেননা তার এক পাখায় আছে রোগজীবাণু আর অন্য পাখায় আছে তার প্রতিষেধক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِى أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِى الآخَرِ دَاءً 'যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যায়, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেবে। তারপর সেটা ফেলে দিবে।

---

* সহকারী শিক্ষক (ধর্ম), মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, তানোর, রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২০১৭।
২. আবূ দাঊদ, হা/৩৭৬৭, হাদীছ ছহীহ।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০২০।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২০২২।
৫. তিরমিযী, হা/১৮০৫, হাদীছ ছহীহ।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৩২।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৩৩।

কারণ তার দুটি ডানার মধ্যে একটিতে রোগজীবাণু আছে আর অপরটিতে আছে রোগমুক্তি'।[৮] (পানীয় বস্তুতে পড়ে যাওয়া অবস্থায়) মাছি যে ডানাতে রোগজীবাণু আছে সেটিকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অতএব, তা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার পর নিক্ষেপ করা উচিত।

(৭) খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁ না দেওয়া: খাবার ও পানীয়তে ফুঁ দেওয়া যাবে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নাক ও মুখ দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। নিঃশ্বাসে থাকে দেহের দূষিত বাষ্প ও রোগজীবাণুবাহী অপেক্ষাকৃত ভারী বায়বীয় পদার্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা খাবার কিংবা পানির সঙ্গে মিশে আবার মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। ফলে শরীরে বিভিন্ন রোগজীবাণুর আস্তানা গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ 'তোমাদের কেউ যখন কিছু পান করে, তখন সে যেন পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে অথবা ফুঁ না দেয়'।[৯]

(৮) হেলান দিয়ে না খাওয়া: হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা অহংকারের লক্ষণ। সেজন্য নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا 'আমি হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি না'।[১০] তাই হেলান দিয়ে খাবার খাওয়া বর্জন করা কর্তব্য।

(৯) উপুড় হয়ে খাওয়া যাবে না: উপুড় হয়ে বা পেটের উপর ভর করে খানাপিনা করাও নিষিদ্ধ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কোনো ব্যক্তি যেন উপুড় হয়ে না খায়।[১১]

(১০) জগ বা কলসীর মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা: জগ বা কলসীর মুখে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পানি পান করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন করে পান করতে নিষেধ করেছেন।[১২] এতে করে অন্যের সেই জগ বা কলসী থেকে পানি পান করতে রুচিতে বাধতে পারে অথবা ভিতরের কোনো ময়লা বা পোকামাকড় সরাসরি সে খেয়ে ফেলতে পারে।

(১১) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা: পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করতে হবে, এক নিঃশ্বাসে তাড়াহুড়া করে পান করা যাবে না। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ 'নিশ্চয়ই এটি অধিক তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যকর ও উপকারী'।[১৩]

(১২) খাবার শেষে আঙুল ও প্লেট চেঁটে খাওয়া: খাবার শেষে আঙুল ও প্লেট চেটে খেতে হবে। কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى فِى أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ 'যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে, তখন সে যেন তার আঙুল চেঁটে খায়। কেননা তোমরা জানো না যে, কোন খাবারে বরকত আছে'।[১৪] খাওয়ার শেষে আঙুল চেঁটে খাওয়ার গুরুত্ব বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। কারণ আঙুলের মাথা হতে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, যা খাদ্য হজম হওয়াতে সাহায্য করে। আর এজন্যই তরকারিতে আঙুল ডুবালে তরকারি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

(১৩) দাঁড়িয়ে খাবার ও পানীয় গ্রহণ না করা: দাঁড়িয়ে পানাহার করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে, সে যেন তা বমি করে ফেলে'।[১৫] কিন্তু কোনো অসুবিধা বা প্রয়োজনে অথবা বসার মতো উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে দাঁড়িয়ে পানাহার করা যায়।[১৬]

(১৪) পেট পূর্ণ করে না খাওয়া: একজন মুমিনের ভরপেট খাওয়া উচিত নয়। বরং পেটের কিছু অংশ ফাঁকা রেখে তার খাওয়া উচিত এবং পরিমাণে কম খাওয়া উচিত। যতটুকু খাবার তার না খেলেই নয়, ততটুকুই শুধু খাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ পেট থেকে বেশি নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলির এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে'।[১৭]

(১৫) খাবারের সমালোচনা না করা: খাবারের দোষ ধরা যাবে না, এটা সুন্নাতের খেলাফ। মানুষ বুঝতে চায় না, যে বা যারা খাবার প্রস্তুত করেছে, সে কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে তা খারাপ করেনি; বরং মনের অজান্তেই তা হয়ে যায়। তাই খাবারের সমালোচনা করা যাবে না, তা খারাপ হলেও। যতটুকু রুচি হবে ততটুকু খেতে হবে, বাকিটা রেখে দিতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। রুচি হলে তিনি খেতেন আর অপছন্দ হলে তা পরিত্যাগ করতেন।[১৮] অর্থাৎ তিনি মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন, না হলে বাদ দিতেন।

---

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮২।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৩০।
১০. আবূ দাঊদ, হা/৩৭৬৯, হাদীছ ছহীহ।
১১. ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭০, হাসান।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬২৯।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৮।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৩৫।
১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৬।
১৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৭।
১৭. তিরমিযী, হা/২৩৮০, হাদীছ ছহীহ।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২০৬৪।

(১৬) শুকরিয়া আদায় করা: খাবার শেষ হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কারণ খাবারের প্রতিটি দানাই আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামতস্বরূপ। সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 'আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন, যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে'।[১৯]

(১৭) একসাথে বসে খাওয়া সুন্নাত: বড় প্লেটে একসঙ্গে খাওয়া সুন্নাত। আরব দেশে এখনো বড় প্লেটে খাবার গ্রহণের সংস্কৃতি আছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي 'আল্লাহর কাছে প্রিয় খাদ্য হলো যাতে অনেক হাত অংশগ্রহণ করে'।[২০] অর্থাৎ যে খাদ্য অনেকে একসঙ্গে খায়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ 'একজনের খাবার দুইজনের জন্য, দুইজনের খাবার চার জনের জন্য এবং চার জনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট'।[২১]

তবে পৃথকভাবে একাকী খাওয়াও বৈধ। এতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ 'তোমরা একত্রে আহার করো অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার করো, তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই' *(আন-নূর, ২৪/৬১)*।

(১৮) স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা যাবে না: স্বর্ণ-রূপার পাত্রে পানাহার করা নিষেধ। তা কাফেরদের পাত্র আর তাতে অহংকার প্রকাশ পায়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ 'তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করবে না আর তোমরা রেশমী পোশাক পরিধান করবে না। কারণ তা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য'।[২২] তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পানাহার করে, সে ব্যক্তি নিজ পেটে জাহান্নামের আগুন ঢকঢক করে পূর্ণ করে'।[২৩]

(১৯) খাবার পরিবেশনকারীর সবার শেষে খাবে: যে ব্যক্তি খাবার পরিবেশন করবে, সে সবার শেষে খাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ নিজে করেছেন এবং বলেছেন, 'যে লোকদেরকে পানি পান করায়, সে সবার শেষে পান করবে'।[২৪]

১৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৪।
২০. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২১৩৩।
২১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৪৮৯।
২২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৩৩।
২৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৩৪।
২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮১।

(২০) খাদ্য প্রস্তুতকারীকে খাবারে শরীক করা: যে ব্যক্তি খাদ্য প্রস্তুত করে বা খাবার পরিবেশন করে, তার মনের মধ্যে খাদ্যের প্রতি আসক্তি তৈরি হতে পারে, সেজন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকেও খাবারে শরীক করতে বলেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ 'যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তির খাদেম তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজের সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক লোকমা বা দুই লোকমা অথবা এক গ্রাস বা দুই গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা সে (খাদেম) তা রান্না (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে'।[২৫]

(২১) দস্তরখানা, পাটি বা মাদুর বিছিয়ে আহার করা: চেয়ার-টেবিলে না বসে দস্তরখানা, পাটি বা মাদুর বিছিয়ে আহার করা সুন্নাত। ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে জানি না যে, তিনি কখনো ছোট ছোট পেয়ালাতে খাবার খেয়েছেন, তাঁর জন্য কখনো পাতলা রুটিও তৈরি করা হয়নি এবং তিনি টেবিলের উপরও খাবার খাননি'। ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তবে তারা কীভাবে খেতেন? তিনি বললেন, সাধারণ দস্তরখানা বিছিয়ে আহার করতেন।[২৬] তবে চেয়ার-টেবিলে বসে আহার করা নিষিদ্ধ নয়।

(২২) দস্তরখানা উঠানোর সময় দু'আ পড়া: পানাহার শেষে প্লেট বা দস্তরখানা উঠানোর সময় দু'আ পড়তে হবে। তখন বলতে হবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا 'আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, বহু প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, রবকতময় প্রশংসা। হে আমাদের রব! তোমার নেয়ামত হতে মুখ ফিরানো যায় না, তার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং তার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না'।[২৭]

(২৩) দাওয়াতে গেলে মেজবানের জন্য দু'আ করা: কারো বাসায় দাওয়াতে গেলে মেজবানের জন্য দু'আ করতে হবে। মেজবানের জন্য দু'আ, اللهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي 'হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ায়েছে, তাকে তুমি খাওয়াও। আর যে আমাকে পান করিয়েছে, তাকে তুমি পান করাও'।[২৮]

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খানা খাওয়ার তরীকা সম্পর্কে অবগত হলাম। খাওয়া-দাওয়া মানুষের জীবন ধারণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেন নববী তরীকায় খাবার গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৫৭।
২৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪১৫।
২৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৫৮।
২৮. ছহীহ বুখারী, হা/২০৫৫।

বিদ্যুৎ: আল্লাহর একটি মহান দান

*-নাফিউল হাসান**

ভূমিকা: বিদ্যুৎ আল্লাহর অসীম দয়া ও জ্ঞানের এক মহৎ নিদর্শন, যা আধুনিক সভ্যতাকে গতিশীল রাখে। এটি আমাদের জীবনকে সহজতর করে। বিদ্যুৎ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যুৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও কার্যকর এবং টেকসই করে তোলে। অতএব, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে এর সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১) আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন: আল্লাহ পৃথিবীকে একটি সুসংগঠিত নিয়মে সৃষ্টি করেছেন, যেখানে শক্তি ও পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। বিদ্যুৎও এই সৃষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ 'তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন এবং তারাগুলো তাঁর আদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে' *(আন-নাহল, ১৬/১২)*।

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে বিদ্যুৎসহ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি আল্লাহর কুদরতের ফলস্বরূপ এবং মানবজাতির জন্য একটি মহান উপহার।

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম: ফ্যারাডে'স ল অব ইন্ডাকশনের মৌলিক নীতি হলো, যখন একটি কুণ্ডলী বা তার চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে চলতে থাকে অথবা সেই চুম্বকীয় ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়, তখন কুণ্ডলী বা তারের মধ্যে ইলেক্ট্রো-মোটিভ ফোর্স (EMF) তৈরি হয়। এই ইলেক্ট্রো-মোটিভ ফোর্স (EMF) পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বা কারেন্টে পরিণত হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যা আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ।

আল্লাহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ দিয়েছেন। প্রতিটি শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর অসীম জ্ঞানের পরিচায়ক।

পানি ও বাষ্পের শক্তি: পানি বা বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করে টারবাইন চালানো হয় এবং সেই শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সাধারণ এবং কার্যকর উপায়। যেমন- হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট বা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে পানি থেকে বাষ্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ 'আর আমরা আকাশ থেকে পানি নির্দিষ্ট পরিমাণে বর্ষণ করি এবং তা মাটিতে সংরক্ষণ করি...' *(আল-মুমিনূন, ২৩/১৮)*।

সৌরশক্তি: সূর্যের আলোকে সোলার প্যানেল দ্বারা বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়। এটি একটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূর্য আল্লাহর সৃষ্টি, যা কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ 'আর আমরা সৃষ্টি করেছি এক উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য)' *(আন-নাবা, ৭৮/১৩)*।

বায়ুশক্তি: বাতাসের গতির শক্তি টারবাইন দ্বারা বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। বাতাসের শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমানে অন্যতম জনপ্রিয় এবং পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ 'আর আমরা বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি..' *(আল-হিজর, ১৫/২২)*।

জ্বালানি শক্তি: কয়লা, তেল বা গ্যাস পোড়ানো হয় এবং এর থেকে উত্তপ্ত বাষ্প তৈরি হয়ে টারবাইন চালানো হয়, যা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এটি একটি প্রচলিত শক্তি উৎপাদন পদ্ধতি, যা সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي﴾ 'আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন...?' *(আল-হজ্জ, ২২/৬৫)*।

পারমাণবিক শক্তি: পারমাণবিক শক্তি পরমাণুর শক্তি থেকে আসে। পরমাণু বিভাজন বা ফিউশন প্রক্রিয়ায় বিশাল শক্তি উৎপন্ন হয়, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দক্ষ শক্তি উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই সমস্ত পদ্ধতি আল্লাহর অসীম দয়া ও জ্ঞানের প্রতিফলন, যা আমাদের জীবনকে আরও সহজ, উন্নত এবং টেকসই করে তোলে।

(৩) কুরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক: কুরআন আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং তার মধ্যে গোপন রহস্য খুঁজে বের করার জন্য উৎসাহিত করে। কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জীবনের সকল পদক্ষেপ এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে এবং অনুসরণ করতে সাহায্য করে। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ 'তিনি (আল্লাহ), যিনি পৃথিবীকে তোমাদের অধীন করেছেন, তাই তার পথসমূহে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিযিক্ব থেকে আহার করো...' *(আল-মুলক, ৬৭/১৫)*।

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৫নং পৃষ্ঠায়

* প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ।

মুসলিমদের প্রযুক্তিগত পুনর্জাগরণ: সময়ের অপরিহার্য দাবি

*-আবু হিসান নাঈম**

ভূমিকা: মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকা শক্তি হলো প্রযুক্তি। আজকের বিশ্বে যে জাতি প্রযুক্তিতে এগিয়ে, সেই জাতিই বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। একসময় মুসলিমরা ছিল প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে, যা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে আমাদের দুর্বল করে তুলেছে। এই প্রবন্ধে আমরা মুসলিম বিশ্বের প্রযুক্তিগত অবস্থার বিশ্লেষণ করব, পিছিয়ে থাকার কারণ খুঁজে দেখব এবং কীভাবে আমরা আবারও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারি, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা তুলে ধরব।

মুসলিমদের স্বর্ণযুগ- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়:

ইসলাম বরাবরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতেই বলা হয়েছে—

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

'পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১)*। এই আয়াতটি শুধু ধর্মীয় জ্ঞানের কথা বলে না; বরং এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নতুন জ্ঞান অর্জনের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

খলীফা হারুন অর-রশিদ ও আল-মামুনের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমা' ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গবেষণা কেন্দ্র। এখানে গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলসহ বিভিন্ন শাখার গবেষণা চলত।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন[১]:

ইবনে সিনা (Avicenna): আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। তার লেখা 'আল কানূন ফিত তিব্ব' (The Canon of Medicine) শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপের মেডিকেল স্কুলে পড়ানো হতো।

আল-খাওয়ারিজমি: 'অ্যালগরিদম' শব্দটি এসেছে তার নাম থেকে। তিনি আধুনিক গণিতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

ইবনে হাইছাম: আলোকবিজ্ঞান (Optics) এবং ক্যামেরার মূল ধারণা তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

আল-বিরুনী: ভূবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

এসব মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সম্ভব হতো না। কিন্তু প্রশ্ন হলো— আজ আমরা কোথায়?

মুসলিম বিশ্ব কেনো প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়েছে?

(১) গবেষণায় বিনিয়োগের অভাব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের জন্য গবেষণা (R&D) অপরিহার্য। পশ্চিমা দেশগুলো যেখানে তাদের GDP-এর ২-৪% গবেষণায় ব্যয় করে, সেখানে মুসলিম দেশগুলোর বেশিরভাগই ১%-এর নিচে বিনিয়োগ করে।

(২) প্রযুক্তি আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা: আমরা কম্পিউটার, স্মার্টফোন, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম সবকিছুই বিদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে।

(৩) শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) শিক্ষার প্রতি মুসলিম দেশগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দক্ষতা তৈরি হচ্ছে না।

(৪) রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট: অনেক মুসলিম দেশ রাজনৈতিক সংকট ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ব্যস্ত, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রযুক্তিতে অগ্রসর হওয়া কেনো জরুরী?

(১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন: বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কোম্পানিগুলো প্রযুক্তি-ভিত্তিক। যেমন- গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট, টেসলা। যদি মুসলিম বিশ্ব প্রযুক্তিতে উন্নতি করতে পারে, তাহলে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারবে।

(২) প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: ড্রোন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সাইবার সিকিউরিটি এবং মহাকাশ গবেষণায় পিছিয়ে থাকলে মুসলিম বিশ্ব সবসময় নিরাপত্তাহীন থাকবে।

(৩) তথ্য ও মিডিয়া দখলে রাখা: গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া তথ্যযুদ্ধের অন্যতম প্রধান অস্ত্র। মুসলিমদের নিজেদের মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে পারে।

---

* শিক্ষক, মাদরাসা মিনওয়ালিল অহী, চৌধুরীপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. এখানে সবার আক্বীদা-বিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

(৪) আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া: বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। মুসলিম দেশগুলোকে উন্নত গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

মুসলিমদের প্রযুক্তিগত পুনর্জাগরণ কীভাবে সম্ভব?

(১) প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার: স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লকচেইন, রোবোটিক্স, কোডিং অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে।

(২) গবেষণা ও উদ্ভাবনে তহবিল বৃদ্ধি: প্রতিটি মুসলিম দেশকে GDP-এর কমপক্ষে ২-৫% গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হবে এবং মুসলিম বিশ্বে যৌথ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

(৩) নিজস্ব প্রযুক্তি কোম্পানি গড়ে তোলা: গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজনের বিকল্প মুসলিম কোম্পানি গড়ে তুলতে হবে এবং সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং সাইবার সিকিউরিটিতে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৪) মুসলিম দেশগুলোর প্রযুক্তিগত সংযোগ বৃদ্ধি: ওআইসি (OIC) ভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াতে হবে এবং মুসলিম উদ্যোক্তাদের জন্য ফান্ডিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করতে হবে।

উপসংহার: প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ছাড়া মুসলিম বিশ্ব কখনোই প্রকৃত অর্থে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না। এটি কেবল অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তির বিষয় নয়, বরং এটি জাতির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। আমরা যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই এবং গবেষণায় বিনিয়োগ করি, তাহলে আবারও মুসলিমরা প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের শীর্ষস্থান দখল করতে পারবে ইনশা-আল্লাহ। সময় এসেছে নিজেদের পরিবর্তন করার, প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং মুসলিম বিশ্বকে আত্মনির্ভরশীল করার। আমরা কি আবারও বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত? সিদ্ধান্ত আমাদের হাতেই।

‘বিদ্যুৎ: আল্লাহর একটি মহান দান’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

এটি আমাদের প্রকৃতির সঠিক ব্যবহার এবং কুরআনের জ্ঞান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানায়।

(৪) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন: বিদ্যুৎ এবং এর ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা যদি তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দক্ষতা অর্জন করে, তবে তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এই জ্ঞান শুধু ব্যক্তি বা সমাজের উপকারে আসবে না, বরং তা পুরো মানবতার কল্যাণে কাজ করবে।

(৫) বিদ্যুতের গুরুত্ব: বিদ্যুৎ বর্তমানে আমাদের আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর গুরুত্ব নিম্নরূপ—

আধুনিক জীবন: বিদ্যুৎ আমাদের ঘর, অফিস, শিল্প ও প্রযুক্তিকে শক্তি দেয়।

শিক্ষা: বিদ্যুৎ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনকে সহজ এবং কার্যকর করে তোলে।

স্বাস্থ্যসেবা: হাসপাতালের জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল।

উদ্ভাবন: বিদ্যুৎ আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি, যা নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলোর জন্য অপরিহার্য।

(৬) কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ব: আল্লাহ আমাদের সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ ‘...আর অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানদের ভাই’ *(আল-ইসরা, ১৭/২৬-২৭)*।

আমাদের উচিত বিদ্যুৎ সঠিকভাবে ব্যবহার করা, এর অপচয় থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। এটি আমাদের দায়িত্ব এবং আল্লাহর দেওয়া এই অনুগ্রহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার: বিদ্যুৎ আল্লাহর অসীম দয়া ও জ্ঞানের একটি মহান নিদর্শন, যা আমাদের জীবনকে সহজ, উন্নত এবং টেকসই করে তোলে। এটি আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মুসলিমদের জন্য একটি অমূল্য উপহার। কুরআনের জ্ঞান অনুসরণ করে মুসলিমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমাদের উচিত বিদ্যুৎ সঠিকভাবে ব্যবহার করা, এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকা এবং সমাজের উন্নতিতে এর জ্ঞান কাজে লাগানো। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

ফিলিস্তীনিদের উচ্ছেদ করা ইয়াহূদীদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মিসর সংকট

*মূল : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ রাসলান**

*-পরিমার্জিত অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার***

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনিই সৎকর্মশীলদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁর প্রতি ক্বিয়ামত অবধি অবারিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

অতঃপর, বর্তমান চলমান এই সংকটের মুখোমুখি শুধু আমাদের মিসরই নই, বরং আমাদের সমগ্র উম্মাহই আজ এ সংকটের মুখোমুখি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার প্রস্তাব থেকে ফিরে এসেছে। যার অর্থ হলো তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, সেটা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হবে।

খুব সম্ভবত এটি তার একটি কৌশলগত পশ্চাদপসরণ। কেননা এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা যথেষ্ট ভয়াবহ। কেননা অনেকেই ভাববেন যে, যেহেতু ঘোষিত পরিকল্পনা থেকে সে সরে এসেছে, কাজেই বিষয়টি শেষ হয়ে গেছে আর তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি এ রকম বিশ্বাস করবে, ধারণা করবে অথবা সংশয়ে নিপতিত হবে, তবে জানতে হবে যে, তার ইয়াহূদী, জায়নবাদ ও ফ্রিম্যাসনরি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই।

কারণ, যদি তাদের সামনে একটি পথ বন্ধ হয়ে যায়, তারা শত নতুন পথ খোঁজে। ঠিক শয়তানের মতো, যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি পথ দিয়ে প্রবেশ করতে না পারলে অন্য পথ ধরে আসে। এ কারণেই দখলদার ইসরাঈলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা ফিলিস্তীনিদের 'স্বেচ্ছাসম্মত' উচ্ছেদের অনুকূল পরীক্ষানিরীক্ষা ও পন্থা গ্রহণ করে।

এখানে শর্ত নেই যে, তাদেরকে সিনা উপত্যকা বা জর্ডানে নির্বাসিত করতে হবে বরং স্বেচ্ছাসম্মত বাস্তুচ্যুত পূর্ণতা দেওয়ার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ২ লাখ গাযাবাসী স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়তে চাইছেন। এটা হতে পারে মাসের পর মাস তারা যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, দক্ষিণ গাযা থেকে উত্তরে স্থানান্তরের পর সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেয়েছেন। বাসস্থান বলতে কিছুই নেই। সেখানে জীবনযাপন অত্যন্ত কঠিন। রাতের তাপমাত্রা দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। অথচ কোনো গরম কাপড়, বিছানা, দেয়াল নেই যা তাদেরকে বাতাসের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে, কোনো ছাদ নেই, যা তাদেরকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করবে, কোনো চাদর বা বিছানা নেই, যা তাদেরকে কিছুটা উষ্ণ করতে পারে— ফলে প্রচণ্ড ঠান্ডায় সর্বত্র কষ্টের শিকার হয়ে শিশুরা মারা যাচ্ছে। খাবার নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, চিকিৎসা নেই। চারিদিকে শুধুই দুর্ভোগ।

প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, কমবেশি প্রায় ২ লাখ গাযাবাসী দেশত্যাগ করতে চাইছেন। নেগেভ মরুভূমিতে একটি বিমানবন্দর প্রস্তুত করা হচ্ছে, যেখানে 'বানর ও শূকরের ভ্রাতারা' (ইয়াহূদীরা) সেইসব ফিলিস্তীনিদের একত্র করবে, যারা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করতে চায়। তারপর তারা ফিরে আসতে পারবে না। এরপর তাদের অন্য কোনো দেশে পাঠানো হবে। সেখানে প্রলুব্ধকর সাহায্য ও বাসস্থান দেওয়া হবে এই শর্তে যে, তারা আর কখনো ফিলিস্তীনে ফিরে আসবে না! এটাই বিপদ! মানুষ ভাবছে, যখন ঘোষিত সিদ্ধান্ত ফিরে আসা হয়েছে, তাহলে সেটি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়।

আমেরিকার নির্বোধ নেতা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধেই শত্রুতা করছে: এই ব্যক্তি—আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট—সম্ভবত আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ নেতা, সে শুধু নিজ দেশেই নয়, গোটা বিশ্বেও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তার প্রেসিডেন্সির মাত্র তিন সপ্তাহ পার হয়েছে, অথচ ইতোমধ্যেই সে সমগ্র বিশ্বের বিরোধিতা কুড়িয়েছে এবং খোদ আমেরিকার সমাজের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করেছে।

ফলে আজ আমেরিকার সমাজ প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার উপক্রম— রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট। এই নেতা অজ্ঞতাবশত নয়, বরং অন্ধের মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে। এমনকি ইউরোপের সঙ্গেও শত্রুতা সৃষ্টি করেছে সে। ন্যাটোর সামরিক শক্তি এখন সরাসরি প্রস্তুত রয়েছে। কারণ সে ডেনমার্কের মালিকানাধীন একটি দ্বীপ দখল করতে চায়। আর ডেনমার্ক ন্যাটোর সদস্য হওয়ায় এই আগ্রাসন প্রতিহত করতে ন্যাটোও সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বকে এক অদ্ভুত সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ইউরোপ এখন বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছে এবং সামরিক দিক থেকেও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

সে ডেনমার্কের গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ দখল করতে চায়; কিন্তু ইউরোপ তাকে তা কখনোই করতে দেবে না। আর যদি সে সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করে তাহলে এক ভয়ংকর যুদ্ধ বাধবে, যা সবকিছু ধ্বংস করে দেবে, সবুজ বনানী থেকে শুরু করে শুষ্ক মরুভূমি পর্যন্ত সবকিছু ছারখার করে ছাড়বে।

এছাড়াও, সে পানামা খাল দখল করার চেষ্টা করেছিল! সে কয়েকজন মার্কিন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল যারা পানামার সরকারকে এই খালকে মার্কিন মালিকানাধীন করার ব্যাপারে দরকষাকষি করতে বলেছিল। তবে তারা ফিরে আসে। অতঃপর সে মনে করল যেন পানামা খাল ইতোমধ্যেই

---

* বিশিষ্ট দাঈ, কায়রো, মিসর।

** কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

তাদের হয়ে গেছে। তাই সে মার্কিন জাহাজগুলোর জন্য আদেশ জারি করল যেন তারা পানামা খাল দিয়ে পারাপারের জন্য কোনো ফি প্রদান না করে।

পানামা কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, মার্কিন জাহাজগুলোকেও অন্যান্য দেশের জাহাজের মতোই ফি দিতে হবে।

শুধু পানামা খাল নয়, সে কানাডাকেও আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়! মেক্সিকোর সঙ্গে তার গুরুতর সমস্যা রয়েছে। ইউরোপের সব দেশ ও ন্যাটোর সঙ্গেও দ্বন্দ্ব চলছে। যা সামরিক সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হতে পারে।

উপরন্তু সে গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্বকেও শত্রু বানিয়েছে তার এই উদ্ভট ও পাগলাটে চিন্তাধারার মাধ্যমে যে সে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, যে সে গাযা দখল করতে চায়!'

আমেরিকার গাযা দখলের চেষ্টা ও আল-আক্বছার বিরুদ্ধে চক্রান্ত: এটি এক বিস্ময়কর যুগ। যেখানে দাবি এক আর বাস্তবতা আরেক। আর এ দুয়ের ব্যবধান আকাশ-পাতালের মতো! এই যুগে স্বাধীনতা সংরক্ষণের দাবি তোলা হয়, এমনকি মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও। আর তা এমন এক পর্যায়ে যে, নাস্তিকতার স্বাধীনতাও স্বাধীনতা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহকে গালি দেওয়ার স্বাধীনতাও স্বাধীনতা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত! এটাকেই তারা স্বাধীনতা বলে! তারপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর এমনভাবে আক্রমণ চালানো হয়, যা কোনো আইন, কোনো রীতি, কোনো নৈতিকতা, কোনো ধর্ম— কোনো কিছুই অনুমোদন করে না! যেমন গাযা দখল করার পরিকল্পনা! যাতে এটি আমেরিকার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়!

সুতরাং সারকথা হলো: বর্তমানে কিছু কৌশলগত পশ্চাদপসরণ লক্ষ করা গেলেও, এটি সাময়িক। মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তারা করবেই। কারণ খ্রিষ্টান জায়নিষ্টরা এক অদ্ভুত মতবাদের উপর রয়েছে। তারা ইয়াহূদীদের থেকেও বড় জায়নিষ্ট! যদিও তারা খ্রিষ্টান জায়নিষ্ট। তথাপি তারা ইয়াহূদীদের মতোই বিশ্বাস করে যে আল-আক্বছার স্থানে মন্দির পুনর্নির্মাণ করতেই হবে। তবেই তাদের তথাকথিত 'মাসীহ' আবির্ভূত হবে এবং 'সৌভাগ্যের সহস্রাব্দ' শুরু হবে! তারা সবাই চেষ্টা করছে মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে। সেই মন্দির কোথায় রয়েছে?

তারা বলে, 'মন্দির আল-আক্বছা মসজিদের নিচে রয়েছে!' এ কারণেই তারা দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের নিচে খননকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মসজিদের ভিত্তি এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে যে, একটি বিমান শব্দের বাধা ভেদ করলে (যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাতে) মসজিদটি ধসে পড়তে পারে!

তারা এটা করছে তাদের কল্পিত 'মন্দির' খোঁজার জন্য! এটা তাদের আক্বীদা বা বিশ্বাস।

ফিলিস্তীন ও মিসরের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের যুদ্ধ একটি আক্বীদাগত যুদ্ধ: যে বিষয়টি আমাদেরকে ব্যথিত করে তা হলো, যখন আমরা এই ইস্যুতে আলোচনা করি যে, শত্রুপক্ষের নিকট এর আক্বীদাগত শিকড় রয়েছে তখন অনেকেই অস্বীকার ও বিস্ময় প্রকাশ করে; বরং এ কথার তীব্র নিন্দা করে এবং বলে যে, তারা আমাদের সাথে কোনো আক্বীদাগত যুদ্ধে লিপ্ত নয়!!

বাস্তবে তারা আমাদের সাথে আক্বীদাগত যুদ্ধেই লিপ্ত। এমনকি আমাদের উন্নতি ও উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রেও, যেমনটি ইশাইয়া পুস্তকের[১] ১৯তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'আমি মিসরীয়দেরকে মিসরীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব, যাতে ভাই ভাইকে হত্যা করে এবং ভাই ভাইকে বন্দী করে'। আরও বলা হয়েছে, 'নদী শুকিয়ে যাবে, খালগুলো দুর্গন্ধময় হবে এবং মিসরীয়রা তুচ্ছ শহরগুলোতে আশ্রয় নেবে'। মাছ শিকার করা সম্পর্কে নানা কথা রয়েছে, জেলেরা নদীতে কোন কিছু পাবে না কারণ নদী শুকিয়ে যাবে! নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখন লক্ষণীয়, হয়তো তোমরা পিপাসায় মারা যাবে নতুবা সিনা উপত্যকা আমাদেরকে প্রদান করবে, প্রভুর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিনা ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব, যখন আমরা বলি, এটি তাদের আক্বীদার মৌলিক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। তখন বুঝতে হবে যে, এটি তাদের দৃষ্টিতে একটি আক্বীদাগত বিষয়। এমনকি দখলদার রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীও গাযার ওপর চালানো আগ্রাসনের সময় ইশাইয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এটিকে তাদের জন্য রবের প্রতিশ্রুতি হিসেবে উপস্থাপন করেছিল!

এই ভূমি তাদের লক্ষ্যবস্তু, কারণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটি রবের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

এই সম্প্রদায়টি কোনো অনর্থক বা হাসিতামাশা করছে না; তারা আক্বীদার ভিত্তিতে কাজ করে এবং এই আক্বীদা বাস্তবায়নের জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। কারণ তাদের অস্তিত্বই এই আক্বীদার উপর নির্ভরশীল, আর তারা অনেক মানুষকে এই আক্বীদায় প্রভাবিত করেছে। এমনকি এখন 'খ্রিষ্টীয় জায়নবাদ' নামে একটি ধারণা প্রচলিত হয়েছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর মধ্যে ডুবে রয়েছে আমেরিকানরা এবং ইংরেজরাও। তারা সবাই এই ভিত্তি, এই বিশ্বাসের উপর রয়েছে।

যখন আপনি এই কথা বলবেন তখন দেখতে পাবেন যে অনেকে বলছে, এটি বলা উচিত নয় এবং এই যুদ্ধ কোনো আক্বীদাগত যুদ্ধও নয়!

কিন্তু হে মুসলিম ও আরবরা! তোমরা কীসের জন্য যুদ্ধ করছ? তোমাদের অভিপ্রায় কী?

ইয়াহূদীরা বলে, 'ফিলিস্তীন আমাদের, এটি আমাদের ভূমি। তারা একটি সম্পূর্ণ জাতিকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চায়। অথচ ভূমি তাদের নিজেরই। ইতিহাস তাদেরই!

তারা জোরগলায় বলে, ফিলিস্তীন আমাদের ইতিহাস, এটি আমাদের ভূমি এবং এখান থেকে তাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। এমনকি মিসরীয়রাও। যারা প্রতিশ্রুত ভূমির

১. এটি ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তানাখ ও খ্রিষ্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্টের সমন্বয়ে গঠিত একটি ধর্মগ্রন্থ, এই বইয়ের ১৯তম অধ্যায়ে মিসর সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

মধ্যে রয়েছে, তাদেরও চলে যেতে হবে!!

সুতরাং, আমাদেরকে এই ধরনের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং সমস্যাটিকে তার সঠিক রূপে বুঝতে সচেষ্ট হতে হবে।

মিসরের রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করার জন্য আরব ও ইসলামী সংগঠন এবং জনগণের একতা অপরিহার্য: সত্যিই বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই মুহূর্ত পর্যন্ত আরব লীগ কোনো শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেনি। এমনকি ইসলামী সহযোগিতা সংস্থাও (OIC) এই ইস্যুতে কোনো দৃঢ় বিবৃতি দেয়নি। ফিলিস্তীনের ইস্যুটি একটি আরব ও ইসলামী ইস্যু। আরব লীগের উচিত ছিল আমাদের মিসরের রাষ্ট্রপতি এবং জর্ডানের রাজা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাতের আগেই একটি জরুরী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা। অবশ্যই এই উপাদান থাকতে হবে। অবশ্যই মিসর, ফিলিস্তীন আরব জাতিসহ মুসলিম জাতির ইচ্ছা-অভিপ্রায় প্রতিফলিত হতে হবে, এই অভিপ্রায়টি অত্যন্ত জোড়ালো ও অকাট্য হতে হবে। এমনকি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান সেখানে গেলে তিনি আমাদের এই জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবেন।

আমাদের জাতি কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত কোনো সিদ্ধান্ত বলার জন্য যাওয়া আর এই জাতির অভিপ্রায় ঠিক করার জন্য যাওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

আর শুধু এই অঞ্চলের প্রতিটি আরব এবং প্রতিটি মুসলিম নয়, বরং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি মুসলিম ফিলিস্তীন ইস্যু নিয়ে ভাবে। এই ইস্যুটি একটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। ফিলিস্তীনের ইস্যুটি একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু। যার জন্য মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কষ্ট ভোগ করেছেন। মুসলিমরা দীর্ঘ সময় ধরে এই সমস্যায় ভুগছে। বহু দশক ধরে তারা এই কষ্ট ভোগ করছে— যখন থেকে আমাদের এই প্রিয় ভূমিতে দূরাগত লোক দ্বারা এই রাষ্ট্রটির সূত্রপাত হয়েছে।

আমাদেরকে অবশ্যই এই ধরনের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের মনে এই বিষয়টি সদা জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। আর এই ইস্যুটি আমাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে। এটি আমাদের মুসলিমদের ইস্যু, আমাদের আরবদের ইস্যু। আমাদের জন্য সমীচীন হলো আমাদের মনে এই বিষয়টি সদা উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত থাকা এবং যারা সচেতন নয় তাদের সচেতন করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ আমরা যে নীরবতা লক্ষ করছি, বিশেষ করে সেইসব সংস্থার পক্ষ থেকে, যাদের এই বিষয়ে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল, যেমন আরব লীগ।

আরব লীগ কেন এখনও সমাবেশ আয়োজন করেনি এবং একটি জরুরী শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেনি যেখানে তারা একটি দৃঢ় ও স্পষ্ট বিবৃতি দেবে? এই ধরনের ইস্যুকে হালকা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

এই ধরনের ফালতু কথাগুলো পাগলের প্রলাপ, যেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। কীভাবে কোনো ভূমিকে তার অধিবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায়?! কীভাবে একটি সম্প্রদায়কে তাদের ভূমি ও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যায়?!

গাযার দুঃখী মানুষের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য শয়তানী পরিকল্পনা: বিপজ্জনক বিষয় হলো, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা চক্রান্ত করছে। যারা কষ্ট ভোগ করছে তাদেরকে কষ্ট লাঘব করার প্রলোভন দেখিয়ে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা করছে। তারা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফিলিস্তীনিদের বহিষ্কার করার চক্রান্ত আঁটছে। তারা প্রলোভন দেখিয়ে বলছে, ২ লক্ষ মানুষকে স্বেচ্ছায় স্থানান্তর করা হবে। এছাড়াও যারা যাবে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হবে। আর যদি বাকিরা না যায়, তবে হোয়াইট হাউস বা ব্ল্যাক হাউসের ব্যক্তি ইয়াহূদীদের ও ফিলিস্তীনিদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের হুমকি দেবে এবং আবারও আক্রমণ করবে। তখন এই সংখ্যার চেয়েও বেশি মানুষ বেরিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এমনকি এ অঞ্চলকে তার অধিবাসী ও মালিকদের থেকে খালি করে দিতে হবে।

এটাই হলো আসল বিপদ! আর এই কষ্ট বাস্তব, আপনি এটি অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার আপনি এটাও বলতে পারবেন না যে, 'অটল থাকুন এবং ধৈর্য ধরুন!'

কারণ তারা দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ধরেছে। দীর্ঘ সময় ধরে অটল থেকেছে। গাযার এই দুঃখী মানুষরা অনেক কিছু সহ্য করেছে এবং এখনও সহ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের শক্তির একটি সীমা আছে। মানুষ কোনো কোনো সময় এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে জীবন সংরক্ষণের স্বাভাবিক আগ্রহ সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর পরওয়া করে না।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদেরকে অটল রাখেন এবং তাদের কষ্ট দূর করেন।

আরব লীগ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (OIC) একটি জরুরী বৈঠক আহ্বানের অপরিহার্যতা: জরুরী ভিত্তিতে আরব লীগের এক বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করা প্রয়োজন যাতে একটি দৃঢ় ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। OIC যদি ফিলিস্তীনের ইস্যুতে সমবেত না হয়, তাহলে কখন সমবেত হবে?! OIC যদি ফিলিস্তীনের ইস্যুতে একত্রিত না হয়, তাহলে কখন একত্রিত হবে? একটি দৃঢ় ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। যে সিদ্ধান্ত প্রতিটি বিষয়ে পরিষ্কার অবস্থান নেবে।

আর এই হঠকারিতা ও পাগলামিকে কেউ মেনে নেবে না। এটা স্পষ্ট যে, শক্তির ব্যবহারেরও একটি সীমা আছে। আর প্রতিটি মানুষকে তার সীমার মধ্যে থাকা উচিত!

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের দেশ ও সকল মুসলিম দেশকে নিরাপদ রাখেন এবং আমাদের সকলের শেষ পরিণতি উত্তম করেন। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম - এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল ছাহাবীর উপর।

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ রসলান
রবিবার, ১০ শা'বান, ১৪৪৬ হিজরী
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

অনৈক্যের ফলে বিশ্ব মুসলিমের পরিণতি

*-মোস্তফা ইউসুফ আলম**

এককালে যে মুসলিমজাতির অঙ্গুলি হেলনে প্রবল পরাক্রমশালী রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজমুকুট খসে পড়েছিল, যে জাতির জাগ্রত শক্তির সম্মুখে শত্রুদলের বিপুল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ইমারতগুলো ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল, মদীনায় নব্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সিংহভাগ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল, যে জাতি মহাসমুদ্র মন্থন করে দুর্জয় গিরি উল্লঙ্ঘন করে নব নব আবিষ্কার দ্বারা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে, উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির সকল অঙ্গনে একক প্রভুত্ব ক্বায়েম করেছিল, যে জাতির সার্বিক সফলতায় স্বস্তি, শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের সংহতিতে মুগ্ধ হয়ে আজও শ্রদ্ধাভরে সকল জাতি যাকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করে— সময়ের আবর্তনে মহাগৌরবান্বিত সেই জাতির দিকে তাকালে মনে হয় এ জাতিই পৃথিবীর সবচেয়ে ইয়াতীম, অসহায় ও দুর্বল জাতি! কেন এ ব্যতিক্রম অবস্থানে এই মহান মুসলিম জাতি?

উপর্যুক্ত কঠিন প্রশ্নকে সামনে রেখে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করতে চাই। ঐক্য-চেতনা মুসলিম জা তির প্রাণশক্তি। যেমন- মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ 'তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরো, তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে; যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[১] অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা ইসলামের এসব মহামূল্যবান নির্দেশ উপেক্ষা করে আজ শত শত দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের সংহতিকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেছি। এসব বিভক্তি ও অনৈক্য মুসলিম পতনের মূল কারণ। অনৈক্য ও মতপার্থক্যের ফলে মুসলিম জাতি ধ্বংসোন্মুখ দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছে। প্রধানত: দুটি অঙ্গনেই মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে খোলাফায়ে রাশেদার পর থেকে শত, সহস্র যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কোটি কোটি মুসলিম ভাইকে অন্য মুসলিম ভাইয়েরা হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রবণতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চিন্তাধারা হলো লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তে হোলি খেলতে হয় খেলব, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করতে হয় করব, অসংখ্য ক্ষুরধার প্রতিভাকে চির বিদায় দিতে হয় দেব— তবুও ক্ষমতা আমার চাই! অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি হয়েছে মাথা কাটা বুদ্ধি!

যেমন: কারো মাথা ব্যথা করলে মাথা ব্যথার ঔষধ প্রয়োগ না করে বরং মাথা কেটে ফেলাই শ্রেয়— এমন নির্বুদ্ধিতাই হয়েছে আমাদের শুভবুদ্ধি। এহেন আত্মহিংসার ফলে ও ক্ষমতা লিপ্সার দরুন রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা এক হতে পারলাম না। ফলে যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক অঙ্গন একটি কসাইখানায় পরিণত হয়ে আসছে।

(২) আক্বায়েদ ও মতবাদের দিক দিয়ে আরো বেশি অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়; কেউবা সুন্নী, কেউবা রাফেজী, কেউবা খারেজি, কেউবা জাবরী, কেউবা মু'তাযিলী, কেউবা আশআরী। আবার পীর মুরিদীর দিক দিয়ে কেউবা কাদেরিয়া, কেউবা চিশতিয়া, কেউবা নকশাবন্দিয়া, কেউবা মোজাদ্দেদিয়া, কেউবা মাইজভান্ডারীয়া, কেউবা ফকিরি মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে একই মুসলিম নানা প্রকার মত ও পথের দিশারী হয়ে একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে গোটা মুসলিম জাতি আজ ইতিহাসের পাতায় শতধা বিভক্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

যুগে যুগে মুসলিম জাতির অনৈক্যের ফলে অবস্থা এমন হয়েছে যে, লক্ষ লক্ষ ইট দিয়ে যে ঘর তৈরি হয় সে ঘরের বিভিন্ন স্থানে যদি ফাটল ধরে, তাহলে সে ঘরের যে অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থা ঠিক তাই হয়েছে। ফাটা দালানকে চুনকাম করে যেমন টিকানো যায় না; ফাটল বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারলে তবেই রক্ষা— ঠিক তেমনিভাবে মুসলিমদের অনৈক্যের স্থলে সংহতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেই তবে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব। তা নাহলে এক কালের গৌরবান্বিত মুসলিম জাতি যে ধ্বংসের চরম সীমায় পৌঁছে যাবে, তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ও দিবালোকের ন্যায় ধ্রুব সত্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

* কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫; মুসনাদ আহমাদ, হা/১৮৪০১।

আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের উপায়

*[১৫ শা'বান, ১৪৪৬ হি. মোতাবেক ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. খালেদ আল-মাহনা** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি 'পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন' *(গাফির, ৪০/৩)*। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরিত আমাদের নবী, ইমাম ও নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। তাঁর বংশধরদের উপর, সমস্ত ছাহাবী ও মহান অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা সে দিনের ভয় করো, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেওয়া হবে। আর তাদের উপর যুলম করা হবে না' *(আল-বাকারা, ২/২৮১)*।

হে মুসলিমগণ! যখন মহান আল্লাহ আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর থেকে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাদেরকে তাঁকে রব, সৃষ্টিকর্তা ও এক ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়ার জ্ঞানসহ সৃষ্টি করলেন। একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ সম্মান ও ভালোবাসা লাভের উপযুক্ত আর তাদেরকে ও তাদের বংশধরকে সৃষ্টি করেছেন দুঃখ-কষ্ট, আদেশ-নিষেধ ও ভালোমন্দের দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য। সেই সুমহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি আত্মাগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এগুলোর মধ্যে রেখেছেন গতি ও ইচ্ছাশক্তি, অভিপ্রায় ও সংকল্প, ভালোবাসা ও ঘৃণা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা। মহাজ্ঞানী ও মহান সৃষ্টিকর্তা অবগত আছেন যে, তাঁর বান্দার নফসসমূহ যদিও কল্যাণ ও সুন্দরের উপরে তৈরিকৃত; কিন্তু তা মন্দের ইচ্ছা থেকে মুক্ত নয়, যখন তা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অন্তরের রয়েছে আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া ও পাপ কাজ থেকে পিছপা হওয়ার প্রবণতা। তার রয়েছে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ এবং মন্দ কাজের প্রতি ইচ্ছা।

আর মহান আল্লাহ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি পরম ক্ষমাশীল ও তওবা কবুলকারী। মাখলূক্ব সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তা (সেই লিপি) তাঁর কাছে আরশের উপরে রয়েছে। তা হলো, 'আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করবে'।[১] নিশ্চয়ই তাঁর অগাধ ও বিস্তৃত দয়া সকল সৃষ্টির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। যার প্রভাব আসমান ও যমীনব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে। তার মধ্যে একটি হলো তিনি তাঁর নিজ দয়ায় তাঁর তাওহীদপন্থি মুসলিম বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। কারণ তিনি পরম ক্ষমাশীল। এ কারণে তিনি নিজেকে 'গফূর', 'গাফফার' ও 'গাফির' বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর ক্ষমা এমন যে, তা পাপগুলোকে এমনভাবে আড়াল করে দেয়, যাতে পাপীরা তাদের পাপের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত না হয়। সেই সাথে তাদের পাপ মুছে ফেলা হয় এবং তাদের শাস্তি ক্ষমা করা হয়, যতক্ষণ না সেই পাপ কুফর বা বড় শিরক পর্যায়ে পৌঁছায়। কারণ শিরকের গুনাহ কখনও ক্ষমা করা হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(আন-নিসা, ৪/৪৮)*। আর সেই ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় ইস্তিগফার হলো ক্ষমাপ্রাপ্তির মূল কারণ ও ভিত্তি এবং সবচেয়ে বড় উপায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টিকে ইস্তিগফারের আদেশ দিয়েছেন, যাতে তাঁর উম্মত তা অনুসরণ করে। আর তিনি তাওহীদের জ্ঞানার্জনের নির্দেশের পরেই ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব, জেনে রাখো! নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১৯)*।

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর ক্ষমার প্রতি অগ্রগামীদের শিরোমণি এবং আল্লাহর কাছে ইস্তিগফারকারী বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয়কারী। হাদীছে এসেছে, প্রতিটি মজলিসে হিসাব করে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার তওবা গ্রহণ করো। কারণ তুমিই তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী'।[২] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও বেশি ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি'।[৩]

---

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৫১।
২. তিরমিযী, হা/৩৪৩৪।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭।

ইস্তিগফারের ফযীলত ও মর্যাদার বড় প্রমাণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে মুমিন বান্দাদের জন্য ইস্তিগফারের ইলহাম করেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, হে আমাদের রব! আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন আর জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন’ *(গাফির, ৪০/৭)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত ছালাতের স্থানে বসে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু‘আ করতে থাকবে যে, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করো, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তুমি তার তওবা কবুল করো, যতক্ষণ না সে অপরকে কষ্ট দেয় এবং অপবিত্র না হয়’।[৪]

ইস্তিগফারের ফযীলত হলো আল্লাহ তাআলা ইস্তিগফারের সাথে দিন-রাত ও জীবনকে অতিবাহিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মুত্তাক্বী বান্দাদের প্রশংসা করে এবং জান্নাতুন নাঈম নির্ধারিত হবে এমন কর্মের বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, ‘রাতের সামান্য অংশই তারা ঘুমিয়ে কাটাত আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/১৭-১৮)*। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সারাজীবন ধরে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, ‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী’ *(আন-নাছর, ১১০/১-৩)*। এজন্য নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর পবিত্র যবান থেকে সর্বশেষ উচ্চারিত বাণী ছিল, ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো আর আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিত করো’।[৫]

আর ইস্তিগফারের ফযীলত ও বান্দার জন্য ইস্তিগফারের প্রবল প্রয়োজনীয়তা থাকার কারণে মুত্তাক্বীদের ইমাম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, তারা যেন ইস্তিগফারের মাধ্যমেই (দিনের কাজ) শুরু করে এবং তা দিয়েই শেষ করে। সায়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু‘আ পড়া, ‘হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না’।[৬]

এই বরকতময় নববী দু‘আতে এমন সমস্ত উপাদান রয়েছে, যা ইস্তিগফার কবুল হওয়ার বড় কারণ। এতে আল্লাহর কাছে তাঁর তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ ও উলূহিয়্যাহর স্বীকৃতি, তাঁর প্রতি বান্দার সম্পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়, আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকারোক্তি, বান্দার নিজের পাপের স্বীকৃতি এবং আল্লাহর ক্ষমার প্রতি চূড়ান্ত নির্ভরতার মধ্যস্থতায় ইস্তিগফার করা হয়েছে। কেননা একমাত্র তিনিই ক্ষমা করার যোগ্য এবং এটি তাঁর রুবূবিয়্যাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, অন্য কারও জন্য নয়।

যখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি এবং এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছালাতে পড়ার জন্য একটি দু‘আ জানতে চাইলেন, তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে শিখিয়ে দিলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক যুলম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল’।[৭]

এই বরকতময় ইস্তিগফারের দু‘আটি সায়্যিদুল ইস্তিগফারের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে পার্থক্য হলো এই দু‘আটি বান্দার নিজের নফসের প্রতি কৃত যুলমের স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু হয়েছে। কেননা নিজের নফসের উপর যুলম করা কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ফিতরাত হলো আল্লাহকে ভালোবাসা ও তাঁকে মহিমান্বিত করা। কিন্তু যখন মানুষ গুনাহ করে, তখন সে তার ফিতরাতের বিপরীতে চলে যায় এবং নিজেকে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির সম্মুখীন করে।

এই দু‘আটিতে বান্দার গুনাহের স্বীকারোক্তি, আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন এবং তাঁর গুণাবলির মাধ্যমে তাওয়াসসুল বা মধ্যস্থতা করা হয়েছে। এটি আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ব্যক্তিদের দু‘আ। এর মর্যাদা ও প্রতিদান অনেক বেশি, যা ইঙ্গিত করে যে, দু‘আকারী নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন এবং সে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত। তার অন্তর নত হয়েছে এবং যাবতীয় অহংকার তার অন্তর থেকে দূর হয়েছে। এটি এমন দু‘আ, যা কবুল হওয়ার আশা করা যায় এবং যার মাধ্যমে দু‘আকারী আল্লাহর

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৯।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৭৪।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৬।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৩৪।

ক্ষমার শীতল পরশ লাভ করতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আন-নিসা, ৪/১১০)*।

যখন তাওহীদ ইস্তিগফারের সাথে মিলিত হয়, তখন বান্দার জন্য অমুখাপেক্ষিতা ও সৌভাগ্য লাভ করা সহজ হয় এবং তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দাদেরকে ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বলুন, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(আল-মুমিনূন, ২৩/১১৮)*। কাজেই বান্দা সর্বদা তার আমল কবুল হওয়ার কামনা করে। সে তার আমলের ত্রুটি নিয়ে শঙ্কিত থাকে। সে সবসময় আশঙ্কায় থাকে যে, তার কৃত আমল আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে তো? সে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করে, যাতে তার আমল ত্রুটিমুক্ত থাকে। এজন্য ইসলামী শরীআতে ছালাত শেষে তিনবার ইস্তিগফার করার বিধান রাখা হয়েছে।

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারীরা ইবাদতের পর সর্বদা বেশি বেশি ইস্তিগফার করেন। কারণ তারা নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও আল্লাহর মাহাত্ম্য ও তাঁর মহিমান্বিত সত্তার সাথে উপযুক্ত হক্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে না পারার বাস্তবতা উপলব্ধি করেন। একইভাবে বান্দা যখন কোনো না কোনো পাপ করেই থাকে, তখন সে এর শাস্তিকে ভয় পায়। তাই সে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করে, যেন আল্লাহ তার পাপসমূহ মুছে দেন এবং তা গোপন রাখেন।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইস্তিগফার হলো গুনাহের জন্য অনুতাপ ও আল্লাহর হক্বের প্রতি অবহেলা করার জন্য অন্তরের লুকানো অনুশোচনা।

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যা তার সত্তার জন্য উপযুক্ত। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই ইস্তিগফার সর্বোত্তম সৎকর্ম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর একটি, যার দ্বারা বান্দাগণ উত্তম পুরস্কার লাভ করে এবং তাদের থেকে কঠিন শাস্তি দূর হয়।

বান্দা বড়ই নিঃস্ব এবং গুনাহগার। যদি তার প্রতি আল্লাহর ক্ষমা না থাকত, তাহলে সে তার পাপের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেত না। কেননা সকল বিপদ-আপদের মূল কারণ হলো বান্দাদের পাপ এবং এই বিপদ দূর করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আযাব দিবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে' *(আল-আনফাল, ৮/৩৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, তাদের মধ্যে দুটি নিরাপত্তার মাধ্যম ছিল— আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ইস্তিগফার। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু ইস্তিগফার এখনো রয়ে গেছে'।[৮]

হে মুসলিমগণ! ইস্তিগফার হলো বরকত লাভের এক মহান মাধ্যম। যাকে ইস্তিগফারের পথ দেখানো হয়েছে, তার দরজায় কল্যাণের বহর এসে উপস্থিত হয়েছে এবং দুঃখ-কষ্ট ও হতাশা সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে। কেননা পাপ যখন দুঃখ-কষ্ট, সংকট ও বিপদ-আপদের কারণ হয়; তখন ইস্তিগফার সেসব থেকে মুক্তির উপায় হয়ে দাঁড়ায় এবং বান্দার জন্য কষ্টকর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে প্রশান্তি, সমাধান, সুস্থতা ও রিযিক্বের পথ উন্মুক্ত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দিবেন আর দিবেন নদীনালা' *(সূরা নূহ, ৭১/১০-১২)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! যেমন আল্লাহর কাছে দু'আর মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়া হয়, তেমনি ক্ষমা লাভের জন্য কিছু সৎ আমলও রয়েছে, যা তাঁর ক্ষমা লাভের বড় মাধ্যম। এ কারণেই নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের কাছে সেই সব আমলের জন্য দু'আ করেছেন, যা তাঁর দয়া ও ক্ষমা লাভের আবশ্যকীয় মাধ্যম। এগুলো হলো নেক আমল ও আনুগত্যের কাজ। এমন সব সৎ আমল, যা গুনাহ মাফ হওয়া নিশ্চিত করে এবং যা বান্দার তওবা সঠিক হওয়া ও সততার সাথে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার উপর প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে; তখন তুমি বলো, তোমাদের উপর সালাম। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া। নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্যে থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে, তারপর তওবা করে এবং শুধরে নেয়; তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-আনআম, ৬/৫৪)*।

হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক। অতএব, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই তো পরম ক্ষমাশীল!

---

৮. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৯০৩৭।

রবের নিকট প্রকৃত সফলতা

*- আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল হাফীয়**

সমস্ত গুণকীর্তন ও স্তুতি সেই মহান প্রভুর জন্য, যিনি আমাদেরকে সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের উপর কৃপা করে ঈমান দান করে ধন্য করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর।

ভূপৃষ্ঠের উপরের সকলেরই একটাই লক্ষ্য 'সফলতা'। কীভাবে সে সবকিছুকে মাড়িয়ে কিঞ্চিৎ হলেও সাফল্য অর্জন করতে পারে; দুনিয়া ও পরকাল কীভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে এটা নিয়েই সকলের চিন্তা। কেউ সফলতা বলছে বড় বড় অট্টালিকা আর দালানকে। কেউ বলছে বড় অঙ্কের ব্যাংক-ব্যালেন্সকে, কেউ খুঁজছে মোটা বেতনের চাকরি। এরই নাম কি সফলতা? যারা ইসলামকে গুরুত্ব না দিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্বে গমন করে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করছে তারা কি আদৌ সফল হতে পেরেছে? সফলতা কি শুধু তাৎক্ষণিক হাসিখুশি, প্রফুল্লতা আর চিত্তবিনোদনের মাঝেই সীমাবদ্ধ? নাকি সফলতার আরও কোনো অর্থ আছে? তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতে পারব যে, প্রকৃত সফল ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে আমাদের মহান প্রতিপালক সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

﴿وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

'সময়ের কসম! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত; তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আল-আছর, ১০৩/১-৩)*।

মহান রব শপথ করে বলেছেন যুগের শপথ, সময়ের শপথ। মহান অধিপতি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত শপথ করে বলেন না অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, নিম্নে যে বিষয়টির বর্ণনা আসছে সেটা একান্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যারাই এই ভূপৃষ্ঠে দিনাতিপাত করছে সকলেই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চার শ্রেণির মানুষকে আলাদা করেছেন, যারা এই ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা দুনিয়া ও পরলোকে সফলতা অর্জন করবে এবং তারা হবে প্রকৃত সফল।

১ম প্রকার: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, যারা বিশ্বাস করেছে মহান রব এক, তিনি ব্যতীত আর কোনোই রব নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। যারা অনেক ইলাহে বিশ্বাসী নয়; তাদের কোনো চিন্তা নেই। মহান রব তাদের সম্পর্কে বলেন, ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ 'শুনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তারা পেরেশানও হবে না, যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত' *(ইউনুস, ১০/৬২-৬৩)*।

২য় প্রকার: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ যারা সৎকর্মশীল, যারা সকাল হতে আরম্ভ করে রাত পর্যন্ত মহান রবের ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকে। যারা তাদের রবের আদেশ মোতাবেক তাঁর বার্তাবাহক রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহকে আগে রেখে সকল প্রত্যাদেশ, আদেশ, নিষেধসমূহ গ্রাহ্য করে চলে। যারা প্রত্যহ তাদের উপর আরোপিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথরূপে আদায় করে, যারা ছিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে, হজ্জ সম্পাদন করে, সৎকর্মের প্রতি আদেশ ও অসৎকর্ম হতে বেঁচে থাকে এবং অন্যদেরকে বেঁচে থাকার প্রতি উৎসাহিত করে। যারা ক্বিয়ামতের দিন মহান রবকে ভয় করে। সর্বোপরি হারাম কর্ম, সূদ, ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি হতে দূরে থাকে; তারাই প্রকৃত সফলকাম।

৩য় প্রকার: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ যারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়; সত্যের ওপর অটল, অবিচল ও একনিষ্ঠ থাকার উপর উপদেশ দেয়। যারা সেই পথের দিকে পরামর্শ দেয়, যেই পথের উপর অটল থাকতে মহান রব আদেশ করেছেন এবং তাঁর দূত প্রেরণ করে সেই পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। যেই পথের মাঝে নেই কোনো ভ্রষ্টতা, নেই কোনো অন্যায়-যুলুম। যারা কল্যাণের পথের দিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সেই শ্রেণির লোকদেরকে মহান রব সফল হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, তারা বিপথগামী যাত্রী ও ক্ষতিগ্রস্ত নয়; বরং তারাই সফল।

৪র্থ প্রকার: এই শ্রেণির বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তিনি আলাদা করে বলেন যে, ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ যারা পরস্পরকে ধৈর্যের ব্যাপারে পরামর্শ ও উপদেশ দেয়, তারা সেই ক্ষতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না আর তারা সফলকাম।

ধৈর্য ধারণ ৩ প্রকার:

(১) সৎকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে যে কষ্ট আপতিত হয়, সেই কষ্টসমূহ স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে ধৈর্য ধারণ করা এবং সেই আনুগত্যের কাজগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পাদন করে যাওয়া। কষ্টে নিপতিত হয়ে সেই কর্ম ত্যাগ না করা।

(২) অসৎকর্ম পরিহারে ধৈর্য ধারণ করা। নিজেকে অসৎকর্ম হতে নিবৃত রাখতে আপন নফসের উপর যে কষ্ট আপতিত হয়, সেই দুঃখ-কষ্টকে সন্তুষ্ট চিত্তে খুশি মনে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করা। সদাসর্বদা এই পণ করা যে, যেটাই হোক না কেন আমি অসৎকর্মে জড়িয়ে পড়ব না। এরপর যথাসাধ্য ধৈর্য ধারণ করা।

(৩) মহান রব আমার তাক্বদীরে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার উপর বিশ্বাস রেখে তার উপর ধৈর্য ধারণ করা, কখনোই তার প্রতিবাদ না করা ও তাতে অখুশি না থাকা। তাক্বদীরের উপর নির্ভর না করে আপন কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলা। তাই প্রকৃত সফল হলো, যে উক্ত চার প্রকার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

পরিশেষে বলব, আমরা সকলেই মহান আল্লাহর সৃষ্টি, সকলেই তাঁরই কৃপায় বেঁচে আছি। তিনি যাদেরকে সৎপথ দেখান, তার কোনো অনিষ্টকারী নেই আর যাকে ক্ষতির মধ্যে রাখতে চান, তার নিবৃতকারী কেউ নেই। তাই আমরা তাঁর কাছেই কামনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে থেকে বের করে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

* অধ্যয়নরত, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

পহেলা বৈশাখের আড়ালে যত কথা

*-ইবনু মাসউদ**

পহেলা বৈশাখ, দুটি শব্দ আলাদা ভাষা থেকে উদ্গত হয়ে একটি উৎসবের নাম ধারণ করেছে। পহেলা শব্দটি উৎপত্তিগতভাবে উর্দূ শব্দ পেহেলী থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রথম। উল্লেখ্য, এ শব্দটি ভারতে পয়লা বলেও উচ্চারণ করা হয়। বৈশাখ শব্দটি এসেছে বিশাখা নামক নক্ষত্রের নাম থেকে। এই মাসে এই নক্ষত্রটি সূর্যের কাছে দেখা যায়।[১] পহেলা বৈশাখ দিনটি বাংলা পঞ্জিকার প্রথম দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত তিন ধরনের ক্যালেন্ডার রয়েছে— (১) হিজরী সন, (২) বাংলা বা ফসলি সন এবং (৩) খৃস্টাব্দ বা গ্রেগোরিয়ান সন। তিনটি ক্যালেন্ডার থাকলেও বাংলা সনের নববর্ষ পালন করে নিজেকে বাঙালি পরিচয় দিতে সকলে গর্ববোধ করে। বিশেষ করে এটা বলতে হয় যে, কেউ বাংলা মাসের খোঁজ রাখে কি-না তা নিয়ে বিশাল সন্দেহ! কিন্তু পহেলা বৈশাখ আসলেই পান্তা-ইলিশ, বৈশাখি মেলা, নাচ, গান, যাত্রা, সার্কাস, তিতারি শাক, চাল-বুট ইত্যাদি রান্নায় সকলে মেতে উঠে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পহেলা বৈশাখ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ!

ইতিহাস:

খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন সম্রাট আকবর। মোদ্দাকথা হচ্ছে, হিজরী সন অনুযায়ী খাজনা দিলে তা চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। তাই সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌর সন এবং হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। এই গণনা শুরু হয় আকবরের সিংহাসনের সময় থেকে। প্রথমে এই গণনা ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।

তখনকার সময়ে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হতো। তার পরদিন ভূমির মালিকেরা নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তারা এই দিনে হালখাতা খুলত। হালখাতা বলতে পুরো বছরের হিসাবনিকাশ চুকিয়ে নতুন বছরের হিসাবের জন্য খাতা খোলাকে বুঝায়। হালখাতার দিনে ব্যবসায়ী কিংবা দোকানদারেরা ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে থাকেন। অনেক অঞ্চলে এই হালখাতার প্রচলন এখনও চলমান আছে।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থার মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ পালিত হয়। ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সনের আগে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।[২]

তথাকথিত অনেক সুশীল বক্তব্যের মধ্যে বলে থাকে, পহেলা বৈশাখ হাজার বছরের ইতিহাস। প্রিয় পাঠক! মাত্র ৪৪১ বছরকে (১৫৮৪-২০২৫ খ্রি.) হাজার বছরের ইতিহাস বলা কতটা হাস্যকর!

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে একটা কথা সংযোজন করছি, পহেলা বৈশাখের জনক বলা হয় সম্রাট আকবরকে। কিন্তু ইতিহাস বলছে সম্রাট আকবর ছিলেন মঙ্গোলীয় এবং ফারসী ভাষী। পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের উৎসব এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট আকবর বাঙালি হলে এসব তথাকথিত সুশীলদের কথার সাথে একমত হওয়া যেত!

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ:

বাংলাদেশে ১৯৬৪ সনে পহেলা বৈশাখের পরিচিতি ঘটে। তার তিন দশক পূর্বে কামরুল হাসান গ্রামীণ মেলার নামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তথা বৈশাখি মেলা শুরু করেন বাংলা অ্যাকাডেমির সবুজ চত্বরে। তখন থেকে শুরু হয় 'পহেলা বৈশাখ'।[৩]

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ এর প্রচলন শুরু হলেও তেমন একটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। জনপ্রিয় হয়ে উঠে ১৯৮৯ সালে। ছায়ানটের শিল্পীরা বটমূল খ্যাত অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সূর্য উঠার পরপর সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানান। ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। মঙ্গল শোভাযাত্রাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউট-এর উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইন্সটিটিউটে ফিরে আসে। এই মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে তারা বার্তা

---

* অর্গানাইজার, রেনেসাঁ লিটারেচার অ্যান্ড কালচারাল ডিপার্টমেন্ট, রেনেসাঁ ফাউন্ডেশন।

১. বৈশাখ উইকিপিডিয়া দ্রষ্টব্য।

২. যুবায়ের আহমেদ, বাংলা নববর্ষ অজানা বৈশাখ (হিলফুল ফুযূল প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৪), পৃ. ১০।

৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৭ এপ্রিল, ২০১৮।

দিয়ে বলে থাকে যে, এটা বাংলার আবহমান গ্রামীণ জীবন এর রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। এ যেন ইতিহাসের ব্যাপারে শাহবাগীদের ডাহা মিথ্যাচার!

ইতঃপূর্বে পহেলা বৈশাখ সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে দেখা যায়, মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখের ইতিহাস নয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরেকটু সংযোজন করা আবশ্যক। ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে হালখাতা করে থাকে, সাথে থাকে মিষ্টান্ন আপ্যায়ন। কলকাতার অলিগলিতে দোকানদারেরা সকল পণ্যে বিশেষ ছাড় দেয়, যার কথ্য নাম 'চৈত্র সেল'। আপনার বিশ্বাস না হলে পহেলা বৈশাখের দিনে কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে কেমন ভিড় হয় একটু জানুন।[৪]

পহেলা বৈশাখ কি বাঙালি সংস্কৃতি?

মোটা দাগে একটা প্রশ্ন সকলের মনে আসে, পহেলা বৈশাখ কি বাঙালি সংস্কৃতি? উত্তরটি জানতে হলে আবারও ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

বাংলার প্রাচীন মানুষেরা ছিলেন দ্রাবিড় বা নূহ আলাইহিস সালাম-এর বড় ছেলে সামের বংশধর। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে ইয়াফিসের সন্তানদের একটি দল আর্য নামে ভারতে আগমন করে। এক পর্যায়ে তারা ভারত দখল করে আর্য ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আর্যরা বাঙালি সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেন। বেদে ও পুরাণে বাংলা ভাষাকে পক্ষীর ভাষা ও বাঙালিদেরকে দস্যু, দাসের ভাষা ইত্যাদি বলা হয়েছে।

সত্যিকারার্থে বাঙালি সংস্কৃতি বলতে বাংলার লোকজ সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বুঝানো হতো। ক্রমান্বয়ে আর্যরা বাঙালিত্ব বলতে ভারতের হিন্দুত্ব বলে দাবি করেন। ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব বলে দাবি করেন এবং ভারতের সকল ধর্মকে হিন্দু ধর্মের কৃষ্টি ও সভ্যতা গ্রহণে বাধ্য করেন।[৫]

পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলছি, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পহেলা বৈশাখের ইতিহাসের সাথে উপরের কথার অমিল না খুঁজে চলুন প্রমাণ খুঁজি। এখানে বলা হয়েছে, আর্যরা হিন্দুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। আমরা পহেলা বৈশাখ বলতে বুঝি প্যাঁচার মুখোশ, হাতির প্রতিকৃতি, রাজহাঁস, ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো প্রতিকৃতি, ময়ূরসহ নানা জীবজন্তুর চিত্র। মোটা দাগে বলতে হয়, পহেলা বৈশাখ পালন করা সকলে বলছে, বাঙালির সংস্কৃতি! ইতঃপূর্বে আমরা পহেলা বৈশাখের ইতিহাসে দেখেছি উপরে উল্লিখিত প্রতীকের কোনো নাম নেই।

তাহলে প্রশ্ন উঠে, উপরে উল্লিখিত প্রতীকগুলো তাহলে কী? প্যাঁচা হলো হিন্দু ধর্মের দেবী লক্ষ্মীর বাহন। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে লক্ষ্মী হলো ধন, সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী।[৬] হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, গণেশের পূজা করলে সব বাধা ও অশুভ প্রভাব কেটে যায়। এজন্য গণেশ মূর্তিকে (হাতির মুখাবয়ব) সাফল্য ও সমৃদ্ধির বাহক মঙ্গল মূর্তি বলা হয়।[৭] হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, রাজহাঁস হলো দেবী সরস্বতীর বাহন।[৮] বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের যে প্রতিকৃতি নিয়ে পহেলা বৈশাখে যাত্রা করা হয়, এই ষাঁড় হলো হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী শিবের বাহন।[৯]

ঠিক এভাবেই পহেলা বৈশাখ এর প্রতিটি কর্মকাণ্ডের সাথে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিল রয়েছে। তা বিশদ আকারে আলোচনা করলে প্রবন্ধ বড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আচ্ছা পহেলা বৈশাখ এর পোশাক কী সেটা তো আপনারাই জানেন। পুরুষেরা ধুতি ও কোনাকাটা পাঞ্জাবি পরে, যা হিন্দুদের জাতীয় পোশাক। মেয়েরা লাল পেড়ে সাদা শাড়িসহ হাতে রাখি বাঁধে, শাঁখা পরে, কপালে লাল টিপ ও চন্দন এবং সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। তারপরও কেউ এসে বলবে, নাহ এটা বাঙালি উৎসব। ভারতীয় দাদাবাবুদের পত্রিকা আনন্দবাজার শিরোনাম দিয়েছে, ঢাকার পয়লা যেন অষ্টমীর একডালিয়া। দেখুন! দাদাবাবুরা পহেলা বৈশাখকে তুলনা করছে অষ্টমীর সাথে।[১০]

তারপরও কিছু বাঙ্গু সুশীল 'তালগাছ আমার'-এর মতো চিৎকার করে বলবে, পহেলা বৈশাখ বাঙালির উৎসব।

পহেলা বৈশাখ যেন ব্ল্যাক নাজারিন:

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পহেলা বৈশাখ সংশ্লিষ্ট তেমন কোনো বই নেই বললেই চলে। তারপরও এ বিষয়ে বেশ কিছু নথি পাওয়া যায়। একদল গবেষক মনে করেন, পহেলা বৈশাখ এসেছে ব্ল্যাক নাজারিন থেকে। প্রশ্ন হলো, ব্ল্যাক নাজারিন কী? ব্ল্যাক নাজারিন হলো যিশু খ্রিষ্টের একটা কালো মূর্তি। ফিলিপাইনের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি

৪. প্রাগুক্ত।

৫. আ স ম শোয়াইব আহমাদ, পহেলা বৈশাখ ইতিহাস ও বিধিবিধান (সম্পাদনায়: ড. আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া)।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা কেন জানেন? লিংক: http://bit.do/eNyfW

৭. এই সময়, সাফল্য ও সমৃদ্ধির বাহক মঙ্গল মূর্তি শ্রী গণেশ। লিংক: http://bit.do/eNyg5

৮. বাংলা ট্রিবিউন, দেবী সরস্বতীর বাহিনি। লিংক: http://bit.do/eNyhp

৯. এই বেলা, শিবকে চিনেন, কিন্তু তার বাহন নন্দীর মাহাত্ম্য কি জানেন? লিংক: http://bit.do/eNyhB

১০. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ এপ্রিল, ২০১৯।

যিশুর কালো মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলে খালি পায়ে যায় এবং তারা বিশ্বাস করে, যে এই মূর্তিটি ছুঁতে পারবে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। কাঠের মূর্তি ছুঁতে পারলে মানুষ কখনো অসুস্থ হবে না— এ যেন পৃথিবীর চরম হাস্যকর বিশ্বাস। এই ব্ল্যাক নাজারিনে কমপক্ষে ৮ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করে।

যেকোনো ঘটনা নিয়ে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। ঠিক তেমনি ব্ল্যাক নাজারিনের সাথে পহেলা বৈশাখের মিল থাকা, এটাও গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি। সর্বোপরি এই ব্ল্যাক নাজারিনের সাথে প্রায় মিলে যায় পহেলা বৈশাখ।[১১]

পহেলা বৈশাখে চাপা পড়া বোনের আর্তনাদ:

প্রিয় পাঠক! পহেলা বৈশাখের অন্তরালে কী ঘটছে তা যদি আপনারা জানেন, তাহলে কখনো এই উৎসব পালন করতে উৎসাহী হবেন না। এই দিনে যে শুধু হোলি খেলা আর রং মাখামাখি হয়, বিষয়টা এমন না। এই দিনে আমার আপনার বোনকে গণধর্ষণ করা হয়। একদল কুচক্রী মহল আমার আপনার বোনকে ধর্ষণ করে নববর্ষের সূচনা করে। আর আমরা পালন করি পহেলা বৈশাখ। নিচে কিছু মিডিয়ার শিরোনাম ও তার প্রমাণস্বরূপ তথ্যসূত্র দেওয়া হলো।

পহেলা বৈশাখে ঘুরতে বেরিয়ে গণধর্ষণের শিকার তরুণী,[১২] পহেলা বৈশাখের যৌন নির্যাতনে আবার তদন্তের আদেশ,[১৩] মাদক খাইয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ! নববর্ষের রাতে হাঁসখালির ছায়া তেহট্টে,[১৪] পহেলা বৈশাখের মেলায় ঘুরতে যাবে বলে এক কিশোরী গণধর্ষণের শিকার।[১৫]

এর বাইরে কত ঘটনা যে মিডিয়ার শিরোনামের অন্তরালে পড়ে আছে, সেটা আমি আপনি জানি না। আমার কাছে এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ থাকলেও আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় প্রকাশ করলাম না।

ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ:

মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হতো ২৫ মার্চ তারিখে। নববর্ষ পালনের কারণ ছিল খ্রিষ্টীয় মতবাদ অনুযায়ী, ঐ দিন মাতা মেরীর নিকট ঐশী বাণী প্রেরিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৫২ সালে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার সূচনার পর রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পয়লা জানুয়ারি নববর্ষ উদযাপন করে। ঐতিহ্যগতভাবে এই দিনটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন হতো। ইয়াহূদীদের 'রোশ হাসানাহ' ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ইয়াহূদীদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত হিসেবে পালিত হয়। ঠিক এভাবেই প্রতিটি জাতির সকল উৎসব এর মধ্যে ধর্মীয় চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন ধর্ম নববর্ষ উদযাপনে উৎসাহ প্রদান করলেও ইসলাম ঠিক তার বিপরীত। কেননা ইসলাম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে উৎসব বলতে শুধু বছরে দুটি ঈদ।[১৬]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা অনুভব করেছি, পহেলা বৈশাখ হিন্দু সংস্কৃতির একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা মুসলিম হিসেবে বিজাতীয় উৎসব পালন করতে পারি না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি বিজাতীয়দের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত'।[১৭]

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কোথাও এমন কোনো দলীল নেই যে, পহেলা বৈশাখকে হালাল করবেন; বরং অনেক প্রমাণ আছে পহেলা বৈশাখ হারাম হওয়ার বিষয়ে। সর্বোপরি ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ পালন করা হারাম। কেননা এখানে আক্বীদাগত ও কর্মগত বহু অনাচার সংঘটিত হয়ে থাকে।

পরিশেষে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার শিরোনামে তথাকথিত সুশীলরা পহেলা বৈশাখকে বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, যা আমি আপনি ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছি না। শেষে এই কথাটি বলতে হয়, ইতিহাসের পহেলা বৈশাখকে তথাকথিত সুশীলরা আধুনিক করে বলে বাংলা নববর্ষ।

একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কিংবা আপনার পরিবারের কেউ কি কোনোদিন পহেলা বৈশাখ উদযাপনে যায়নি? আপনি না গেলেও আপনার আদরের বোনটা গেছে। আর কত এই ফাঁদে পা দিবেন? চলুন! পহেলা বৈশাখকে না বলি! আর সাথে সাথে এই পহেলা বৈশাখের সঠিক ইতিহাস চর্চা করি। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব চাই।

---

১১. ALJAZEERA, Hundreds of thousands join annual catholic procession in Manila. link: http://bit.do/eNyfo

১২. দৈনিক যুগান্তর, ১৮ এপ্রিল, ২৪। লিংক: https://www.jugantor.com/country-news/796014

১৩. বিবিসি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬। লিংক: https://www.bbc.com/bengali/news/2016/02/160223_dhaka_univ_new_year_abuse_investigate_again

১৪. ইটিভি ভারত বাংলা টিম, ১৫ এপ্রিল, ২০২৪। লিংক: https://www.google.com/amp/s/www.etvbharat.com/amp/bn/!state/minor-girl-allegedly-gangraped-after-giving-drugs-on-nababarsha-night-in-nadia-wbs24041505297

১৫. চ্যানেল 24, ১৫ এপ্রিল, ২০১৯। লিংক: https://youtu.be/7gzvCBy2l-s?si=3Ptgne5AITjdxSxH

১৬. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪, হাদীছ ছহীহ।

১৭. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাসান।

তারা কেন অবহেলিত?

*-মোছা. সুমাইয়া শোভা**

আল্লাহ তাআলার এই সৃষ্টিজগতে বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে নারীদেরকে পুরুষের অধীন করে দিয়েছেন।

যাহোক, আমি আজ অন্য একটা বিষয় নিয়ে কিছু কথা লিখার চেষ্টা করব, যে বিষয়টা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে।

সমাজে যে কত প্রকার মানুষ আছে, সেটা গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা একেক মানুষ একেক রকমের। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ শ্যামলা, কেউ ভালো, আবার কেউ খারাপ ইত্যাদি। সমাজে ছেলেদের গায়ের রং তথা কালো বা ফরসা ধরা হয় না, তাহলে মেয়েরা কালো হলে কেন তাদের এত কথা শুনতে হয়? কেন তাদের বাবা-মায়েদের অপমানিত হতে হয় সমাজে? সে কি নিজে নিজে কালো হয়েছে? নাকি তার প্রতিপালক অনেক যত্ন করে তাকে এই রং দিয়ে বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে একটি করে বিশেষ গুণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ, সবাইকেই একটি করে বিশেষ গুণ দিয়েছেন।

আচ্ছা, এই কালো মেয়েরা কী অপরাধ করেছে, বলুন তো? একটি মেয়েকে একটা ভালো পরিবারে বিয়ে দিতে হলে তার চেহারা সুন্দর হতে হবে, গায়ের রং ফরসা হতে হবে, মোটাও হওয়া যাবে না, আবার চিকনও হওয়া যাবে না, মিডিয়াম থাকতে হবে, খুব বেশি লম্বাও হওয়া যাবে না, আবার খাটোও হওয়া যাবে না, চুল সুন্দর লম্বা হতে হবে, বাবার অঢেল ধনসম্পদ থাকতে হবে; তাহলে সবাই ভালোবাসবে, সমাজের লোকেরা তাকে ভালো বলবে, ভালো চোখে দেখবে, ভালো পরিবারে বিয়ে হবে।

কিন্তু কালো মেয়েরাও ভালো মনের অধিকারী হয়। তাদের আপনারা অবহেলা করবেন না। কারণ তারা তাদের রূপ নিয়ে কখনো অহংকার করে না, তারা মানুষকে কিছু বলার আগে কয়েক বার ভেবে দেখে। কেন জানেন? কারণ তারা কালো বলে সমাজের মানুষের অনেক অপমান, লাঞ্ছনা তাদেরকে সহ্য করতে হয়। তারা জানে এগুলো ভোগ করতে তাদের কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয়। কত পরিবার আছে, মেয়েকে দেখতে এসে কালো বলে উঠে চলে যায়। তাদেরকে বলি, আরে! তাদের গায়ের রংটাই শুধু দেখলেন! তাদের অন্য গুণগুলো তো আগে জানার চেষ্টা করুন। নাহ, কোনো কথাই নেই, ওই যে মেয়ে কালো। যখন বারবার দেখতে এসে এভাবে উঠে চলে যায়, তখন বাবা-মায়ের মনটাও এক পর্যায়ে ভেঙে যায়। কতশত পরিবার আছে, এই অপমানগুলো সহ্য করতে না পেরে বাবা তার নিজের মেয়ের সাথে কথা বলতে চায় না। সবার সামনে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। কী এরকম হয় না? হ্যাঁ, অবশ্যই হয়। এজন্য আজ এগুলো আপনাদের নিকটে তুলে ধরছি। আর মা, মায়ের কথা আর কী বলব? বাবার রোজ নানা ধরনের কথা তাকে শুনতে হয়। আর প্রতিবেশীদের তো কানাঘুষা চলতেই থাকে যে, এবার এসেও কেউ পছন্দ করেনি?

এভাবে দেখা যায় যে, বারবার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কারণে মেয়ের বয়স অনেক বেড়ে যায়। তারপরও মা যেহেতু ওই কালো মেয়েকে গর্ভে ধরেছিলেন, তাই তিনি সবকিছুকে ধৈর্য ধরে মেনে নিতে পারেন। শেষে যদি বিয়েও হয় তাহলে দেখা যায় যে, ছেলে ভালো নয় অথবা ছেলে বেকার অথবা পরিবার ভালো নয় কিংবা অনেক টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে হয়। তারপরও শান্তির কথা এই যে, এখন মা-বাবাকে আর সমাজের মানুষের কাছ থেকে কটু কথা শুনতে হবে না আর এটা ভেবে ওই মেয়েগুলো বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। ওই মেয়েরা তো কিছুই বলতে পারবে না। কারণ তারা যে কালো, এটাই তাদের দোষ। এত অবহেলা, এত কথা শোনার পরে কি তারা সুখী হতে পারে? কী ভাবছেন? না, তারা সুখী নয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির খোঁটা দেওয়া কথা শুরু হয়। এমনিতেই কালো বউ, তারপরও বউয়ের বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা দেওয়ার কথা ছিল, সে যৌতুকের টাকাটা তো ওখানেই পড়ে আছে, এরকম নানান কথা শুরু হয়ে যায়।

মেয়েগুলোকে সারাদিন এই কথাগুলো শুনতে হয় কেন? ওই যে কালো তাই। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে তার স্বামীও বিরক্তির স্বরে বলে, যাও গিয়ে বাপের বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা নিয়ে এসো, না হলে আমি তোমার মতো মেয়েকে ভাত দিতে পারব না, তুমি তো কালো। আরও বলে, তোমাকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, আমার মতো মানুষ তোমাকে নিয়ে আর সংসার করতে পারবে না ইত্যাদি। এমন হাজারো অপমানজনক কথা তাকে হজম করতে হয়।

প্রতিদিনের এই হাজারো অপমান একটা সময় তার অসহ্য মনে হয় আর তখনই তার নিজেকে এই জগৎ সংসারে অতি তুচ্ছ কীট মনে হতে থাকে। ঠিক এমনি একটা মুহূর্তে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

কেন এই অবহেলা তাদের প্রতি? কেন এত অপমান? কিছুই নয়, ওই যে তারা কালো, এটাই তাদের দোষ। তারা যাবে কোথায়? তারা কি মানুষ নয়? আসলে তারা কালো বলে তাদের সুন্দরভাবে সম্মান নিয়ে বাঁচার কোনো অধিকার নেই।

---

* শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

হে আমার ভাই! আমি আপনাদেরকেই বলছি, আপনারা তাদের গুণ দেখে বিয়ে করুন; রূপ দেখে নয়। কারণ এই রূপ একদিন থাকবে না। কিন্তু যখনই কোনো কালো মেয়েকে বিয়ে করতে যাবেন, তখনই মানুষ আপনাকে বারবার সতর্ক করে বলবে, ভুল করো না, মেয়ে কিন্তু কালো, দশটা মানুষের সামনে যাবে, মানুষ কী বলবে! একটু ফরসা হলে ভালো হতো, তখন আপনার মন ভেঙে যাবে। কিন্তু হে আমার ভাই! আপনি মনোবল হারাবেন না। কেননা ধৈর্যের ফল সর্বদা সুমিষ্ট হয়।

তাদের গায়ের রং কালো হতে পারে, তবে সবার চেহারা তো আর খারাপ নয়। আমার দেখা মতে, অধিকাংশ কালো মেয়েদের চেহারা অনেক আকর্ষণীয়। তাদের আচার-আচরণও খুব ভালো লাগে। এটা কিন্তু সত্য যে, ফরসা মেয়েদের চেয়ে কালো বা শ্যামলা মেয়েদের চেহারা যথেষ্ট সুন্দর হয়।

হে আমার মায়েরা! এবার আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের সকলেরই কি ধবধবে ফরসা মেয়ে আছে? কালো মেয়ে কি নেই আপনাদের? অবশ্যই আছে। আমার দেখা অনেক মায়েরা তাদের ছেলের জন্য ফরসা বউ খোঁজে, অথচ তার নিজের ছেলেই তো কালো। আপনি কি আপনার মেয়ের কথা ভাবেন না? যদি আপনার মেয়েকে দেখতে এসে কালো বলে ওঠে চলে যায়, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? খুব ভালো লাগবে কি? না, লাগবে না। কারণ সে আপনার মেয়ে। ঠিক তেমনি যে মেয়েকে আপনি কালো বলে ওঠে চলে এলেন, সেও তো অন্য এক লোকের মেয়ে। আপনি নিজে একটি মেয়ে হয়ে অন্য একটা মেয়েকে কীভাবে এত অপমান করেন? কেন আজ কালো মেয়েদের সমাজে এত নিচু করে দেখা হয়? কেন? কী অপরাধ করেছে তারা? না, তারা কিছুই করেনি, তারা নির্দোষ, তারা নিরুপায়। তাদের একটাই দোষ যে, তাদের গায়ের রং কালো।

অনেক ফরসা মেয়েদের দেখি, তারা কালো মেয়েদের পাশে বসতে চায় না, মিশতে চায় না, কালো মেয়েদের দেখলেই কেন জানি দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

হে আমার বোনেরা! কেন এত অহংকার? আপনার এই সুন্দর ফরসা চেহারা কি থাকবে চিরদিন? ধরে নিন, কোনো এক দুর্ঘটনায় আপনার চেহারা নষ্ট হয়ে গেল, তখন কি করবেন আপনি? অন্যদের কিছু বলার আগে সেখানে নিজেকে একবার বসিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন সবকিছু।

যাহোক, অনেকে মেয়ে দেখতে গিয়ে বলে, মেয়ে তো কিছু মেখে ফরসা হয়নি? যে সময় এসেছে, বলা তো যায় না। ওসব ক্রিম-ট্রিম মেখে ফরসা হওয়া মেয়ে কিন্তু নেওয়া যাবে না। দুদিন পর আবার যেই ছিল, সেই হবে। কেন এ কথা বলেন আপনারা? আমি তো বলব, দোষটা আপনাদের। আজ আপনাদের মতো মানুষদের কথা থেকে বাঁচার জন্য ওই কালো মেয়েদের এই পথটা বেছে নিতে হয়েছে, শুধু আপনাদের জন্য। কতশত মেয়েদের চোখের পানি ঝরে, তার মূল্য কি দিতে পারবেন আপনারা? মনে রাখবেন! সাদা কিছুতে দাগ লাগে তাড়াতাড়ি, তা বুঝাও যায় খুব দ্রুত; কিন্তু কালোতে দাগ লাগলেও তা সহজে বুঝা যায় না।

সমাজে ওই মেয়েদের কিছু বলার থাকে না। কী বলবে তারা? পদে পদে শুধু অপমান শুধু তারা কালো বলে। তাদের দোষটাই হলো এটা। আপনারা কি জানেন, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মাটি নিয়ে বিভিন্ন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? তাই কেউ কালো, কেউ ফরসা, কেউ শ্যামলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কারা কালো, ফরসা বা শ্যামলা সেটা দেখবেন না; বরং তিনি দেখবেন তার অন্তর ও তাক্বওয়া। একবার ভেবে দেখুন তো! আল্লাহ তাদেরকে নিজে সৃষ্টি করার পরেও তাদের মধ্যে কারা কালো, কারা ফরসা তা বাছাই করলেন না। অথচ আপনারা তাঁরই বান্দা হয়ে কালো-ফরসা বাছাই করেন। আপনারা যদি এই রকম বর্ণবৈষম্য করে থাকেন, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

পরিশেষে আমি সেসব মেয়েদের বলবো, যাদের মহান আল্লাহ গায়ের রং কালো দিয়েছেন— আপনারা মানুষের এসব নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে মন খারাপ করে জীবনকে বিষিয়ে তুলবেন না বা নিজেকে তুচ্ছ বা বোঝা জ্ঞান করবেন না; বরং এটাকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা বিবেচনা করে ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান আশা করুন, নিজেকে ইলম ও আমলে সুসজ্জিত করুন। মনে রাখবেন, আল্লাহর কাছে গায়ের রং কোনো সম্মান বা মর্যাদার মাপকাঠি নয়; বরং তাক্বওয়াই হলো তাঁর কাছে সম্মানের মাপকাঠি।[১] কাজেই জীবনের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহে আল্লাহর উপর আস্থা রাখুন, তাঁর কাছেই সব কিছু শেয়ার করুন এবং তাঁর কাছেই নিজের দুর্বলতার অভিযোগ করুন এবং সাহায্য চান। মনে রাখবেন, মানুষের কাছে বর্ণ বিচারে মর্যাদা বা অমর্যাদা হতে পারে; আল্লাহর কাছে নয়। তিনি বলেছেন, 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্য (সমস্ত কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের) পথ সৃষ্টি করবেন' *(আত-তালাক, ৬৫/২)*। মহান আল্লাহ এখানে জীবনের নানান জটিলতা থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করার জন্য কোনো বর্ণের শর্ত করেননি; করেছেন তাকে নিরঙ্কুষভাবে ভয় করার কথা। তিনি আরও বলেছেন, 'আর যে আল্লাহর প্রতি ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট' *(আত-তালাক, ৬৫/৩)*। কাজেই জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, নিজেকে শুদ্ধ রাখুন, আমল দুরস্ত করুন আর আল্লাহর উপর সর্বাবস্থায় ভরসা রাখুন। নিশ্চয়ই তিনি সৎকর্মশীল বান্দার কর্মফল বিনষ্ট করবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

১. দ্রষ্টব্য: সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩।

ঈদুল ফিতর

-এম. আবু বকর সিদ্দিক
ছায়ামঞ্জিল, পূর্ববাসাবাটী, বাগেরহাট।

ওই দেখা যায় নীল গগনে
বাঁকা চাঁদের হাসি,
আনন্দ ছড়িয়ে বলি সবাই—
তাকবির ওঠাক শ্বাসি!
ভোর হলেই শয্যা ছেড়ে
গোসল করব সবে,
নতুন জামায় আতর মেখে
মনটা খুশি হবে।
ঈদের ছালাত আদায় করে
জড়াব সবারে,
ভালোবাসার বাঁধন গড়ে
হাসব আপন করে।
অভাবীদের পাশে থাকব—
দেব সান্ত্বনা,
সুখ-দুঃখের সাথী হব
সবার আপন জনা।
নিয়ম মতো যাকাত-ফেতরা
দিব হিসাব করে,
ঈদের খুশি পৌঁছে যাতে
সব মানুষের ঘরে।

ফিরে এসো রবের ভালোবাসায়

-মো. রাকিব সরদার
নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

প্রতিপালক ডাকছেন তোমায়—
হে আদম সন্তান!
ডেকো আমায়, সাড়া দেব আমি
তোমার প্রত্যেক আহ্বানে।
কিন্তু তুমি আজও উদাসীন,
ডুবে আছো গুনাহের সাগরে,
নাফরমানির মোহে ভুলে গেছ
তোমার প্রভুর ডাক।
প্রভু তো ভালোবাসেন তোমায়,
তবু কেন এত বিমুখ?
এই পৃথিবীর মোহে পড়ে
বঞ্চিত হয়ো না তাঁর রহমত থেকে।
নিশির বাতাসে চোখের জলে
ভেজাও তোমার কপোল,
তোমার একফোঁটা অনুতাপই
নেভাবে জাহান্নামের অনল।
সময় ফুরাবার আগেই
ফিরে এসো রবের ভালোবাসায়।

কবর

-মো. আলমগীর হোসেন
সহকারী শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
লক্ষীকোল (ধুনচি), রাজবাড়ী, ঢাকা।

সবাইতো চলে যায় পৃথিবী ছেড়ে
কেউ রবে না আর তোমাকে ঘিরে,
ভালোবাসা, ধনসম্পদ সবকিছু ফেলে
কী করে রইবে তুমি একলা ঘরে?
কখনও ভাবোনি তুমি এমন হবে
দুনিয়ার সব রং পর হয়ে যাবে,
তুমি, আমি চলছি তো একই পথ ধরে
ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এই ভূবনে।
মরণ যখন এসে ডাকবে তোমায়
নিয়ে যেতে চাইবে দূর নীলিমায়,
শেষ হবে শেষ হবে সব আয়োজন
দেহ থেকে আত্মা বের হবে যখন।
তোমার বাড়িতে হবে মানুষের ভিড়
বলবে হয়তো কেউ কী হলো রে বীর?
কাঁদবে কিছু লোকে কঠিন ব্যথায়
তোমাকে হারিয়ে এক আঁধার মেলায়।
গোসল, দাফন ও জানাযা শেষে
নিয়ে যাবে তোমাকে গোরস্থানে,
আলোর ভুবন ছেড়ে আঁধার ঘরে
কী করে রইবে তুমি ভেবেছ আগে?
বিশ্বাসী, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলেছে যারা
ছালাত পড়েছে সদা আল্লাহর ধ্যানে,
তাঁরাইতো সুখি হবে মৃত্যুর পরে
নূরের পরশ পাবে ইনশা-আল্লাহ।
হে বিপথগামী পৃথিবীর বীর!
ফিরে এসো ইসলামের পথে সময় থাকতে,
গড়ে তোলো জীবনটা সঠিক পথে
যে পথ পেয়েছিলে নবী ও ছাহাবীর মাঝে,
যদি মুক্তি পেতে চাও দুই জগতে।

প্রভুর ধ্যানে

-সামিউল ইসলাম রাসেল
সিরাজগঞ্জ।

শুধুই প্রভুর ধ্যানে ঘুরপাক খায় এই মন,
চারিদিক আযানের ধ্বনি, সুবাসিত ফুলের ঘ্রাণ,
জুড়িয়ে দেয় মনোপ্রাণ,
দিবস-রাত্রি ক্ষণ।
নীল আকাশেতে পাখিদের উড়াউড়ি,
সবুজের বুক চিরে করে ঘুরাঘুরি,
নদীর পানিতে করে ঝলমল,
মাছ নিয়ে খেলা করে ঐ বলাকার দল।
বানের পানিতে আসে পানি
চাষিদের কষ্ট কতখানি,
মাছেরা দেয় হাসি,
মুক্তা রাশি রাশি,
রবের অপার মহিমায়
নেমে আসে ঢল।

নছীহত

-মুগনিউর রহমান তাবরীজ
শিক্ষক ও মিডিয়া হেড, হাবরুল উম্মাহ মডেল মাদরাসা, লক্ষ্মীপুর।

শোনো সবাই দুষ্টুমিটা রাখো এখন বন্ধ
পড়ার সময় মন না দেওয়া সে তো ভীষণ মন্দ।
খেলার সময় খেলা করো, পড়ার সময় পড়া
চললে ভালো কে-বা বলো বলবে কথা কড়া?
আজকে তুমি পড়লে না ঠিক,
বেখেয়ালি এদিক-ওদিক
ক্লাসে ঠায় দাঁড়িয়ে তবে,
শিখিনি পড়া বললে হবে?
সে তো ভীষণ মন্দ
পড়ো পড়ো এখন সবে, দুষ্টুমিটা বন্ধ।
বাবা মায়ের স্বপ্ন কত
কষ্ট তাদের হোক না যত
তুমি যেন আলেম হও, নেই তাতে লেশ দ্বন্দ্ব
পড়ার সময় দুষ্টুমিটা সত্যি ভীষণ মন্দ।
আজকে তোমার হেলাফেলা
বাবার কষ্টে অবহেলা
মায়ের দুঃখ না বুঝলে আর
মনটা কী বা মানে তাহার?
তোমায় ছাড়া শ্বাসটি যে তার হয় বারে বার বন্ধ,
পড়ার সময় মন না দেওয়া সে তো ভীষণ মন্দ
পণ করো সব আলেম হবে,
লেখাপড়ায় কঠোর রবে
তাতেই তবে সফলতা, অন্যথা দোর বন্ধ,
পড়ো পড়ো মনোযোগে, দুষ্টুমি সব বন্ধ।

বইয়ের মূল্য

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম
বইয়ের শব্দ ভাণ্ডার,
সেই বইয়ের ঊর্ধ্ব মূল্য
হয় প্রকাশক কাণ্ডার।
বইয়ের মূল্য থাকবে কম
পড়বে সকলেই বই,
জ্ঞান অর্জনে সিক্ত হবে
বইয়ের শখা ও সই।
বই পড়ায় উৎসাহ দিতে
কমিয়ে দাও তার দাম,
তবেই বই বিক্রি বাড়বে
বাড়বে পাঠক হরদম।
লেখক লিখে পাঠক পেতে
প্রকাশক করে আয়,
মাঝে থেকে হারায় পাঠক
লেখকরা ফেঁসে যায়।

বাংলাদেশ

-রুম্মান ইসলাম
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

আমার দেশের নদীনালা সবার চেয়ে সেরা,
সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ সোনার ফসলে ঘেরা।
আমার বাংলা, তোমার বাংলা—সোনার বাংলাদেশ,
নদীর কূলে, মাঠের ধারে সাজে মোহন বেশ।
ঋতুর রঙে বদলায় রূপ, মুগ্ধ করে মন,
ফুলে ফুলে ভরে থাকে দেশের সব বন।
কুরআনের শাশ্বত বাণী আলোর পথ দেখায়,
আমার দেশের প্রকৃতিতে রহস্য মিশে রয়।

বাংলাদেশ সংবাদ

পাসপোর্ট করতে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে না : প্রধান উপদেষ্টা

জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, পাসপোর্ট করতে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে না। এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে ডিসিদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, রোজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এ কথা বলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, পাসপোর্ট করতে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে কেন? এটা তো নাগরিক অধিকার। আমরা আইন করে দিয়েছি, এখন থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে না। এই কথা গ্রামে পৌঁছাতে হবে। বিনা কারণে এগুলো হয়রানি করে মানুষকে। হয়রানি করা যেন আমাদের ধর্ম। সরকার মানেই হয়রানি করা, এটাকে উল্টে ফেলতে হবে। জন্মনিবন্ধন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অনেক সিদ্ধান্ত ঢাকা থেকে হয়। সেটা কীভাবে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন হয় জানা যায় না। যেমন- জন্মনিবন্ধন। এটার কোনো মা-বাবা আছে বলে মনে হয় না। নিয়ম আছে কিন্তু কোনো মা-বাবা নাই। তিনি আরও বলেন, মধ্য বয়সে কিংবা শেষ বয়সে কোথাও যাওয়া দরকার, পাসপোর্ট করা লাগবে, এজন্য জন্মনিবন্ধন লাগবে। সেই আমলে কে জন্মনিবন্ধন করত জানা নেই। কিন্তু পাওয়া যায়, পয়সা দিলে ঠিকই চলে আসে। পয়সা দিলে যখন আসে, না দিলেও আসার কথা। এই সিস্টেম আমরা করতে পারছি না কেন, এটা তো আসলে নাগরিকদের অবশ্য প্রাপ্য। সরকার ব্যবস্থা করতে পারে নাই বলে অজুহাত দিলে তো চলবে না। নিশ্চয় ব্যবস্থা আছে। কাজেই আমাদের সে ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মসনদ যে যেই বয়সেই চায় তাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়ার দলীল জন্মসনদ। সেটা না হলে এনআইডি পাওয়া যাচ্ছে না, এনআইডি না হলে পাসপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। রাতারাতি করে ফেলার আশাও আমি করছি না। শুরু তো করতে হবে।

দেশজুড়ে মডেল মসজিদ তৈরিতে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে : প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম অভিযোগ করেছেন, দেশজুড়ে মডেল মসজিদ তৈরিতে বিপুল পরিমাণ লুটপাট হয়েছে। ৫৬০টি মসজিদ করা হয়েছে। একটি মসজিদ তৈরিতে ১৬-১৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেই মসজিদ পাড়ার লোকেরা করে ৩ কোটিতে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

যুক্তরাজ্যে রেকর্ড ছাড়িয়েছে মুসলিমবিদ্বেষ

গাযাযুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষ রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। দেশটিতে গত বছর মুসলিমবিদ্বেষের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৬ হাজার। এ সংখ্যাটি এর আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি। ইসলামোফোবিয়া থেকে সংঘটিত নানা ঘটনার ওপর নযর এমন একটি সংঘটন 'টেল মামা' বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা বলেছে, গত বছর নারীদের তুলনায় মুসলিমবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের শিকার বেশি হয়েছেন পুরুষেরা। বেশির ভাগ ঘটনাই ছিল বিদ্বেষমূলক আচরণ, শারীরিক নিপীড়ন, বিভেদ সৃষ্টি ও ভাঙচুরের। অধিকাংশ হামলা হয়েছে সড়ক এবং উদ্যানের মতো খোলা জায়গায়, যেখানে লোকসমাগম বেশি থাকে। কর্মক্ষেত্রে এমন ঘটনা কম ঘটেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষের ৬ হাজার ৩১৩টি ঘটনা ঘটেছে। এটি আগের বছরের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেশি। এসব ঘটনার মধ্যে ৫ হাজার ৮৩৭টি অভিযোগ যাচাই করে নিশ্চিত হয়েছে টেল মামা। সংঘটনটি আরও বলছে, গাযাযুদ্ধ শুরু হওয়া ও সাউথপোর্ট হত্যাকাণ্ডের পর যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষী কথাবার্তা অনেক বেড়েছে। মুসলিমদের সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেও মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে।

ইসরাঈল বিরোধী পোস্টার, হোর্ডিং খুলল দিল্লি পুলিশ

প্রতিবাদের ভাষা কি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? যেভাবে ইসরাঈল বিরোধী, আরএসএস বিরোধী, বিজেপি বিরোধী পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং খুলে নিল দিল্লি পুলিশ তা নিয়ে এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে। দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পুলিশকে দিয়েই মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে মোদি সরকার? গত ২৪

ফেব্রুয়ারি, সোমবার ছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সম্মেলন। সেখানে বিজেপি বিরোধী, আরএসএস বিরোধী স্লোগান সংবলিত একাধিক পোস্টার ছিল। সেখানে সংঘ পরিবার ও বিজেপির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রতিবাদ করা হয়েছিল। একাধিক পোস্টার ছিল ফিলিস্তীনে ইসরাঈলের বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধেও। 'অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ট্রেড ইউনিয়ন'-এর সম্মেলনে এই পোস্টারগুলো রাখা ছিল। তালকাটোরা স্টেডিয়ামে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানস্থলের ভিতরে শ্রমিকদের অধিকার ও দাবি সংবলিত ব্যানার প্রদর্শন করেন আয়োজকরা। ফিলিস্তীনে ইসরাঈলের গণহত্যার নিন্দা করা হয়। দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আরএসএস-বিজেপি যেভাবে ঘৃণা ছড়াচ্ছে তার নিন্দা করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সুচতা দে বলেন, সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় পুলিশ হলের ভেতরে প্রবেশ করে এবং অনেকগুলো ব্যানার খুলে দেয়, যদিও এই সম্মেলনের জন্য পুলিশের থেকে সমস্ত অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৫-৬ জন পুলিশ সম্মেলন কক্ষে ঢুকে কোনো কারণ না জানিয়েই এই পোস্টারগুলো খুলে নেয়। পুলিশের এই ভূমিকা দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই। ফিলিস্তীনের জনগণের উপর ইসরাঈলের আগ্রাসন এবং ভারতের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের বিদ্বেষ ছড়ানোর নীতির বিরোধিতা করা হয়েছে এমন ব্যানারগুলোই তারা বেছে বেছে খুলে নিয়েছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েও ফিলিস্তীনের উপর ইসরাঈলের গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি সেমিনার করার চেষ্টা হয়েছিল। সেটাও বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সম্মেলনে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়।

মুসলিম বিশ্ব

৩ ইসরাঈলির বিনিময়ে মুক্তি পেলেন ৩৬৯ ফিলিস্তীনি

আরও তিন ইসরাঈলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তীনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। মুক্তি পাওয়া বন্দিরা হলেন, আলেকজান্ডার ট্রুফানোভ, সাগুই ডেকেল-চেন এবং ইয়ার হর্ন। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং রোজ শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে গাযার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসে আলেকজান্ডার ট্রুফানোভ, সাগুই ডেকেল-চেন এবং ইয়ার হর্নকে সাদা রঙের গাড়িতে নিয়ে আসে হামাসের সামরিক বিভাগ আল কাসেম ব্রিগেডের একটি দল। সেখানে একটি অস্থায়ী মঞ্চ আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল, আর সেই মঞ্চকে ঘিরে ছিল শতাধিক ফিলিস্তীনি জনতা। মঞ্চে আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থা রেডক্রসের প্রতিনিধিদের কাছে যিম্মীদের হস্তান্তর সম্পর্কিত নথিতে স্বাক্ষর করেন হামাসের এক সিনিয়র সদস্য। তারপর যিম্মীদের সেই মঞ্চে তোলা হয় এবং উপস্থিত ফিলিস্তীনিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার অনুরোধ জানানো হয়। যিম্মীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হওয়ার পর রেডক্রসের গাড়িতে তাদেরকে রাফা ক্রসিং এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন আইডিএফ এবং ইসরাঈলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেটের কর্মকর্তারা। রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা কর্মকর্তাদের হাতে যিম্মীদের সোপর্দ করেন। তারপর আইডিএফের গাড়িতে চেপে ইসরাঈলে প্রবেশ করেন তিন যিম্মী। এ দিকে যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় শনিবার ৩৬৯ ফিলিস্তীনি বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাঈল। গাযা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল গত কয়েকদিনে, তা অবশেষে কেটে গেছে। হামাস জানিয়েছে যে, তারা আশা করছে গাযার যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ইসরাঈলের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা আগামী সপ্তাহেই শুরু হবে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাঈলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় হামাস। সে-সময় ইসরাঈলে ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হয়। এ ছাড়া আরও দুই শতাধিক মানুষকে যিম্মী হিসেবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেই গাযায় পালটা আক্রমণ চালায় ইসরাঈল। গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেখানে ইসরাঈলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৪৮ হাজার ২৩৯ ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ১১ হাজার ৬৭৬ জন। তবে গাযার সরকারি মিডিয়া অফিস মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৬১ হাজার ৭০৯ জন বলে জানিয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

টি-ব্যাগ থেকে মানবদেহে মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিকের প্রবেশ

টি-ব্যাগে চা পানের অভ্যাস আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষ করে অফিস, বাসা বা বন্ধুদের আড্ডায় টি-ব্যাগের মাধ্যমে চা তৈরি করা অনেক সহজ ও সময়সাশ্রয়ী। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে, এই সুবিধার সঙ্গে একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি জড়িয়ে আছে। ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর 'কেমোস্ফিয়ার' জার্নালে প্রকাশিত বার্সেলোনার অটোনোমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে, বাণিজ্যিক টি-ব্যাগ থেকে নির্গত মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিক মানবশরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। গবেষণায় আরও জানানো হয়, পলিমার বা প্লাস্টিক উপাদানে তৈরি টি-ব্যাগ থেকে চা বানানোর সময় লাখ লাখ ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা নির্গত হয়। এ ছাড়াও গবেষণায় ব্যবহৃত টি-ব্যাগগুলো বাজারে সহজলভ্য ব্র্যান্ড থেকে সংগ্রহ করা হলেও সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে এই ব্যাগগুলো তৈরি ছিল নাইলন-৬, পলিপ্রোপিলিন এবং সেলুলোজ দিয়ে। চা তৈরির সময় প্লাস্টিকের এসব উপাদান থেকে বিপুল সংখ্যক মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিক নির্গত হতে দেখা যায়। পলিপ্রোপিলিন: প্রতি মিলিলিটার চায়ের পানিতে ১.২ বিলিয়ন প্লাস্টিক কণা ত্যাগ করে। সেলুলোজ: ১৩৫ মিলিয়ন প্লাস্টিক কণা ত্যাগ করে। নাইলন-৬ : ৮.১৮ মিলিয়ন প্লাস্টিক কণা ত্যাগ করে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলো মানুষের অন্ত্রের কোষ শোষণ করে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে যেতে পারে। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, নির্গত এই প্লাস্টিক কণাগুলো মানুষের অন্ত্রের মিউকাস উৎপাদনকারী কোষে প্রবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, এগুলো কোষের কেন্দ্রস্থল নিউক্লিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নিউক্লিয়াস হলো কোষের জেনেটিক উপাদান নিয়ন্ত্রণকারী অংশ। প্লাস্টিক কণার এই ধরনের কার্যক্রম কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া বার্সেলোনার অটোনোমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আলবা গার্সিয়া-রদ্রিগেজ বলেন, আমরা দূষণ কণাগুলোর উপস্থিতি নতুন প্রযুক্তি দিয়ে শনাক্ত করেছি। এর ফলে মানবদেহের ওপর এর প্রভাব আরও বিস্তারিতভাবে বোঝার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটি ভবিষ্যতে নতুন গবেষণার ভিত্তি তৈরি করবে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক টি-ব্যাগের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সাধারণ চা বানানোর ঝামেলা এড়িয়ে সহজেই পান করার জন্য টি-ব্যাগ এখন অনেকের পছন্দ। তবে এই গবেষণার তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে যেসব টি-ব্যাগ সহজলভ্য, সেগুলোতেও এই ধরনের উপাদান থাকতে পারে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিকের কারণে শরীরে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি, পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি, জেনেটিক উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মিউটেশনের ঝুঁকি, বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ এবং বিভিন্ন রোগ-বালাই ও দীর্ঘমেয়াদে ক্যানসারের ঝুঁকি। টি-ব্যাগের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞরা কিছু সহজ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে পাতা চা ব্যবহার করা বা টি-ব্যাগের পরিবর্তে পাতা চা দিয়ে চা তৈরি করা। প্রাকৃতিক ছাঁকনি ব্যবহার করা যেমন: ধাতব বা কাপড়ের ছাঁকনি দিয়ে চা বানানো নিরাপদ। চায়ের টেকসই ব্র্যান্ড বাছাই করে পরিবেশবান্ধব উপাদান দিয়ে তৈরি টি-ব্যাগ ব্যবহার করা। টি-ব্যাগ ব্যবহারে সচেতনতা জরুরী। এ বিষয়ে গবেষকরা বলছেন, মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিকের মানবশরীরে প্রভাব নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এই গবেষণাগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নীতিমালা তৈরি হতে পারে, যা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করবে। চা আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হলেও এর নিরাপদ উপভোগ নিশ্চিত করতে সচেতন হওয়া জরুরী। টি-ব্যাগের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চা বানানোর অভ্যাস গড়ে তোলা হলে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

দাওয়াহ সংবাদ

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ: ব্যাচ নং- ১৯

আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং শুরু হয়ে ২০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ১৯তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুর রহিম বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। ব্যাচটিতে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ২৬ জন মক্তব শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শিখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ও ছাহাবীদের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

ফিকহুস সিয়াম কনফারেন্স ২০২৫

ফিকহুস সিয়াম কনফারেন্স ২০২৫, ইসলামিক আলো ফাউন্ডেশন ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক সম্মেলন। এটি মূলত রামাযানের ছিয়াম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

স্থান ও সময়: কনফারেন্সটি ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ঢাকার কাকরাইলস্থ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (IDEB) ভবনের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য ও আলোচনার বিষয়বস্তু: এই কনফারেন্সে ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী ছিয়ামের মাসায়েল ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়—

ছিয়ামের ফিক্বহি দিকনির্দেশনা: ছিয়ামের ফরয, সুন্নাহ ও মাকরূহ দিকসমূহ; ছিয়াম ভঙ্গের কারণ ও করণীয়: কী কী কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয় ও পুনরুদ্ধারের উপায়; রামাযানের বিশেষ আমল: কুরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ, দান-ছাদাক্বা ও অন্যান্য ইবাদতের গুরুত্ব; সমসাময়িক জিজ্ঞাসা ও সমাধান: আধুনিক যুগে ছিয়াম পালন সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের শারঈ সমাধান।

কনফারেন্সে যারা আলোচনা পেশ করেন: কনফারেন্সে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন— শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া, শায়খ ড. মানজুরে এলাহী, শায়খ ড. মোকাররম বিন মহসিন মাদানী, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুস সবুর চৌধুরী প্রমুখ।

উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ: কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ১০০০ জন দাঈ অংশগ্রহণ করেন। যাদের ৫০০ জনই আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন তাদের প্রতিজনের হাতে একটি সুন্দর সাবলীল কুরআন মাজীদ, রামাযানের ৩০ দিনে ৩০ আসর নামক একটি বই ও ৩০ পিচ করে উছমানী কায়দা ফ্রি প্রদান করা হয়। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আসন সীমিত থাকায় আগ্রহীদের জন্য পূর্ব রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা ছিল, যা ইসলামিক আলো ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল পেজের মাধ্যমে করা হয়।

ফিকহুস সিয়াম কনফারেন্স ২০২৫, একটি জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ ইসলামিক অনুষ্ঠান ছিল, যেখানে রামাযান ও ছিয়াম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা ইসলামী শরীআহ অনুসারে ছিয়াম রাখার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): আমাদের সমাজে এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোনো বাড়িতে মানুষ মারা গেলে ৩ দিন ঐ বাড়িতে চুলায় আগুন দিতে নিষেধ করা হয়। তাদের ধারণা যে, চুলায় আগুন দিলে যে ব্যক্তি মারা গেছে তার কবরের আযাব বেশি হবে। এ কথা কতখানি সত্য?

-মো. তাহেনুর রহমান
নয়নপুর, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: কেউ মারা গেলে সেই বাড়িতে রান্না-বান্না করাতে ইসলামে কোনো বিধিনিষেধ নেই। ৩ দিন রান্না করা যাবে না বা চুলায় আগুন দিলে মৃত ব্যক্তির শাস্তি বেশি হবে, এ কথা ভিত্তিহীন। তবে মৃতের পরিবার স্বজন হারানোর বেদনায় শোকাহত থাকার কারণে রান্না-বান্নার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। তাই প্রতিবেশীর উচিত পরিবারটির খাবারের ব্যবস্থা করা। আব্দুল্লাহ ইবনু জা‘ফর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জা‘ফর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মৃত্যু সংবাদ এলে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ‘জা‘ফর এর পরিবারের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত করো। কেননা তাদের কাছে এমন খবর এসেছে যে, তা নিয়ে তারা ব্যতিব্যস্ত রয়েছে’ (তিরমিযী, হা/৯৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/১৬১০)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (২): কুরআন, হাদীছ বা কোনো ইসলামী বই স্পর্শ করা, পড়া বা এর সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো ইসলামী ইলম অর্জন এর আলোচনা শোনা বা ক্লাস এর ক্ষেত্রে কি ওযূ অবস্থায় থাকতে হবে?

-হাসিবুল হক
তালতলা, ঢোলাদিয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর: এক্ষেত্রে ওযূ অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। কেননা কুরআন, হাদীছ বা কোনো ইসলামী বই স্পর্শ করা, পড়া বা শোনার জন্য ওযূ করা শর্ত নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩)। ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (হায়েয অবস্থায়) আয়াত পাঠে কোনো দোষ নেই। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা জুনুবীর জন্য কুরআন পাঠে কোনো দোষ মনে করতেন না। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন। উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, (ঈদেন দিন) হায়েয অবস্থায় মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলা হতো, যাতে তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলে ও দু‘আ করে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্লিয়াস (রোম সম্রাট) নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পত্র চেয়ে নিলেন এবং তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল, ‘দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (আপনি বলুন!) হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কোনো কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রবরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম। আত্বা রাহিমাহুল্লাহ জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হায়েয অবস্থায় কা‘বা ত্বওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন; কিন্তু ছালাত আদায় করেননি। হাকাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ করে থাকি। অথচ আল্লাহর বাণী হলো, ‘তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৫ অধ্যায় এর সংশিষ্ট আলোচনা)। উল্লেখ্য, ওযূ ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে না মর্মে ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ আয়াতটি পেশ করা হয়। কিন্তু আয়াতটি উক্ত অর্থে বলা হয়নি এবং তার পক্ষের দলীলও নয়। বরং এ আয়াতে الْمُطَهَّرُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাবর্গ (তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৭/৫৪৪)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ কিতাব, যা আসমানে আছে (তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৭/৫৪৪)। বিস্তারিত দেখুন- নায়লুল আওত্বার, শাওক্বানী, ২য় খণ্ড, ২৫৯-২৬৫ পৃ.; তামামুল মিন্নাহ, ১০৭ পৃ.।

প্রশ্ন (৩): মসজিদে ডান হাত পিছনের দিকে ভর দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় যদি তন্দ্রা বা ঘুম আসে, তাহলে কি ওযূ ভাঙবে?

-আবূ সাইদ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর: এরকম ঘুমে ওযূ ভাঙবে না। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যেতেন, তারপর দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতেন; (এজন্য পুনরায়) ওযূ করতেন না (ছহীহ মুসলিম হা/৩৭৬; আবূ দাঊদ, হা/২০০; তিরমিযী, হা/৭৮)। আর যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমাবে তার ওযূ ভেঙে যাবে। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায়, সে যেন ওযূ করে (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৪৭২)।

প্রশ্ন (৪): প্রস্রাব করার পর ঢিলা নেওয়ার সুন্নাতী কোনো নিয়ম আছে কি? প্রস্রাব করার পর ঢিলা-কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটতে হবে, কাশি দিতে হবে এরকম কোনো বিধান আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
সাভার।

উত্তর: প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যখন যেতেন, তখন আমি এবং অন্য এক বালক পানির পাত্র ও বর্শা নিয়ে যেতাম। সে পানি দিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫২)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এই আয়াত কূবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছে, 'সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে'। রাবী বলেন, তারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন। সে কারণে তাদের শানে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (আবূ দাঊদ, হা/৪৪)। পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে আল্লাহ কূবাবাসীর প্রশংসা করেছেন। কারণ তারা মূলত পানি দিয়েই পবিত্র অর্জন করতেন। উল্লেখ্য, যারা আগে ঢিলা বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করছে এবং পবিত্রতার দাবিতে উক্ত আয়াতটির অধীনে যে হাদীছ পেশ করছে, তা যঈফ আর শরীআতের নামে তা বাড়াবাড়ি। তবে পানি না পাওয়া গেলে ঢিলা-কুলুখ বা টিস্যু পেপার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। আর প্রস্রাব করার পর ঢিলা-কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটা বা কাশি দেওয়া এগুলোর কোনো শারঈ ভিত্তি নেই; বরং এগুলো দ্বীনের মাঝে বাড়াবাড়ি, এর সপক্ষে কোনো দলীল নেই।

প্রশ্ন (৫): স্ত্রীর সাথে সহবাসের কতক্ষণ পর ফরয গোসল করতে হবে এবং কীভাবে করব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: সহবাসের কতক্ষণ পর গোসল করতে হবে, তার কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই। তবে যত দ্রুত সম্ভব ফরয গোসল করে নেওয়া উচিত। ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ গোসল করতে হবে। সহবাসের পর ঘুমাতে চাইলে ওযূ করতে হবে (তিরমিযী, হা/১১৮)। জানাবাতের গোসলের ব্যাপারে মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধুলেন। অতঃপর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন। পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধৌত করলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান হতে সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৯)।

প্রশ্ন (৬): উটের গোশত খেলে ওযূ ভঙ্গ হয়। দুধ খেলেও কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: উটের দুধ ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে যাওয়া উরায়না গোত্রের কিছু লোককে উটের দুধ ও পেশাব খাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৩)। উটের দুধ যদি ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলে দিতেন (মুগনী, ১/২৪৫; আশ-শারহুল মুমতে, ১/২০৯)। আর ওযূ ভেঙে যাওয়া মর্মে যে হাদীছ উল্লেখ করা হয় তা যঈফ। হাদীছটি হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বকরির দুধ পান করার পর ওযূ করবে না এবং উটের দুধ পান করার পর ওযূ করবে' (ইবনু মাজাহ, হা/৪৯৬)। তবে উটের গোশত খেলে ওযূ ভেঙ্গে যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৬০)।

ছালাত

প্রশ্ন (৭): আমি একজন গাড়ি ড্রাইভার। আমার প্রশ্ন হলো, আমি যখন বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বের হব, তখন কত কিলোমিটার যাওয়ার পর আমি কছর ছালাত আদায় করব?

-আনেসুর রহমান
ইটাসরান নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: যাত্রাকে যদি সফর মনে করা হয়, তাহলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে যেখানেই ছালাতের সময় হবে সেখানেই কছর করা যাবে। কেননা কছরের জন্য নির্ধারিত দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং একাধিক হাদীছের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যখন মানুষের যাত্রাকে সফর বলে গণ্য করা হবে, তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যেখানেই ছালাতের সময় হবে সেখানেই কছর করবে। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যোহরের ছালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে আছরের ছালাত দুই রাকআত আদায় করেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪৭)। যুল-হুলায়ফা মদীনা থেকে মক্কার পথে প্রায় ৯ কি.মি. দূরে অবস্থিত। তাই এমতাবস্থায় যেখানে ছালাত আদায় করবে, সেখানে কছর ছালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন (৮): সফরে কছর করে দুই ওয়াক্ত ছালাত একসাথে পড়ার নিয়ম আছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, যোহর ও আছর জমা করে পড়লে দুইবার কি আলাদা আলাদা ইকামত দিতে হবে নাকি এক ইকামতে টানা ৪ রাকআত ছালাত আদায় করতে হবে?

-মো. তাহেনুর রহমান
নয়নপুর, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: দুই ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করার সময় ভিন্ন ভিন্ন ইকামত দিতে হবে। তাই এক্ষেত্রে ভিন্ন ইকামতে দুই রাকআত করে মোট চার রাকআত ছালাত আদায় করবে। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর (মুয়াযযিন) আযান দিলেন, ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহরের ছালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছরের ছালাত আদায় করলেন। তিনি এ দুই ছালাতের মাঝখানে অন্য কোনো ছালাত আদায় করেননি (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৪০)।

প্রশ্ন (৯): সারা রাত না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-পিয়াস মাহমুদ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর: সারারাত না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদ পড়া এটা শরীআতসম্মত পদ্ধতি নয়। বরং অল্প হলেও তা নিয়মিত করা উচিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা আমল করতে থাকো তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। কারণ আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না, বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয় যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৬১)। এক ছাহাবী রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আমল শুনে সারারাত না ঘুমিয়ে ইবাদত করতে চাইলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি ছওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। ছালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩)। তবে কোনো কারণে এমন হলে তাহাজ্জুদ পড়তে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (১০): ইমামের পেছনে অনেক সময় সূরা ফাতেহা পড়তে পারি না, ইমাম রুকূতে চলে যান, এতে কি আমার ছালাত হবে?

-আফযাল
গাজীপুর।

উত্তর: ছালাত জেহরী হোক বা সিররী, ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। উবাদা বিন ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার ছালাত হয় না' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬)। কেননা সূরা ফাতেহা না পড়লে ছালাত হবে না। মুক্তাদীকে ইমামের পিছে পিছে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। পড়াকালীন ইমাম রুকূতে চলে গেলে সূরা ফাতেহা ছেড়ে দিয়ে রুকূতে চলে যাবে এবং তার ছালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮)। সুতরাং এসময় তার রাকআত পূর্ণ হয়ে যাবে। রুকূতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। কেননা রুকূ সূরা ফাতিহা পড়ার স্থান নয়। রুকূকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাকআত গণ্য করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ছালাতে এসে আমাদেরকে সিজদারত অবস্থায় পেলে সিজদায় চলে যাবে। তবে এ সিজদাকে (ছালাতের রাকআত) গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকূ পেল, সে ছালাত পেল' (আবূ দাঊদ, হা/৮৮৯)।

প্রশ্ন (১১): ছালাতরত অবস্থায় সাপ-বিচ্ছু কীভাবে মারতে হয়? বেশি নড়াচড়া করলে কি ছালাত বাতিল হয়ে যায়?

-শহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: কম নড়াচড়ার মাধ্যমে মারতে সক্ষম হলে ছালাতরত অবস্থায় মারবে এবং ছালাত হয়ে যাবে আর বেশি নড়াচড়ার প্রয়োজন হলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে মারতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কালো রঙের দুই প্রাণীকে তোমরা ছালাতরত অবস্থায় হত্যা করো, তা হলো সাপ ও বিচ্ছু' (আবূ দাঊদ, হা/৯২১)।

প্রশ্ন (১২): আমি ৪ রাকআত বিশিষ্ট ছালাতে ইমামের পিছনে তৃতীয় রাকআত থেকে অংশগ্রহণ করেছি এবং ইমাম সালাম শেষ করার পর আমি বাকি দুই রাকআতের জন্য দাঁড়িয়েছি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কি শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব নাকি তার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়তে হবে?

-মোস্তফা আব্বাসী
ঢাকা।

উত্তর: এমতাবস্থায় শুধু সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলাতেন। কিন্তু শেষ দুই রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন। আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহর ও আছরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে আর একটি করে সূরা পড়তেন। আর কখনো কখনো কোনো আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৬২)। আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে আরও দুটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকআতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ

করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৯)। তবে অন্য সূরা চাইলে পড়তে পারে (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫২)।

যাকাত

প্রশ্ন (১৩): আলুর কি উশর দিতে হবে? কোন কোন ফসলের উশর দিতে হবে না?

-মো. মমিনুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: শাক-সবজিতে কোনো উশর দেওয়া লাগবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শাক-সবজিতে কোনো যাকাত (উশর) নেই' (তিরমিযী, হা/৬৩৮; মিশকাত, হা/১৮১৩)। সুতরাং আলুতে উশর দিতে হবে না। তবে ফসল উঠানোর সময় তা থেকে দান করা উচিত। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার প্রতি কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। তবে এ ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ ও অনন্য আয়াত রয়েছে। (তা হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণী), 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখতে পাবে' (আয-যিলযাল, ৯৯/৭-৮) (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৭১)। আর এর অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিক্রম হয়ে যায়, তাহলে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৪৭৩)।

জানাযা

প্রশ্ন (১৪): কোনো ব্যক্তি জানাযার ছালাত পেল না, কিন্তু মাটি দিল; তাহলে সে কি এক কীরাত ছওয়াব পাবে? নাকি জানাযা না পড়লে মাটি দেওয়া যাবে না?

-সোলায়মান আলী
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর: কোনো কারণবশত জানাযা না পেলেও মাটি দিতে পারে এবং সে এক কীরাত নেকী পাবে। কেননা হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দুই কীরাত'। জিজ্ঞেস করা হলো, দুই কীরাত কী? তিনি বললেন, 'দুটি বিশাল পর্বত সমতুল্য (ছওয়াব)' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩২৫)। একটি পাহাড় উহুদ পাহাড়ের ন্যায়। হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী বুঝা যায়, জানাযার ছালাতের জন্য এক কীরাত আর মাটি দেওয়ার জন্য এক কীরাত।

প্রশ্ন (১৫): লাশের খাঁটিয়া বহনের সময় কোন দু'আ পড়তে হবে? লাশ কবরে নামানোর সময় কোন দু'আ বলতে হবে?

-মোছাঃ সানজিদা আক্তার সেতু
বাঁশেরহাট, দিনাজপুর।

উত্তর: লাশ বহনের সময় পরিপূর্ণ নীরব থাকাই সুন্নাত। এ সময় কোনো দু'আ পড়া ভিত্তিহীন। কায়েস বিন আব্বাদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ তিন সময়ে শব্দ করতে অপছন্দ করতেন- যুদ্ধ, জানাযা এবং যিকির (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৩৪২০; বায়হাক্বী, হা/৭২৬২)। আর ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাশ কবরে রাখার সময় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ 'বিসমিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৫০)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৬): গণতান্ত্রিক কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হওয়া কি বৈধ?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: Democracy বা গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা হয়। আর ইসলামে সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি বলেন, 'যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ মহান আল্লাহরই' (গাফির, ৪০/১২)। আরো বলেন, 'বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়' (ইউসুফ, ১২/৪০)। গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শিরক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোনো প্রবেশাধিকার মান্য করা হয় না। এছাড়াও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একজন মুচি বা মেথরও নেতা হতে পারে, যেখানে যোগ্যতা মুখ্য বিষয় নয়। তাই গণতান্ত্রিক কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন (১৭): মহিলারা যদি তাদের বাবা-মায়ের কবর দেখতে চায়, সেক্ষেত্রে কবরের কাছে যাওয়া যাবে কি?

-আহসান উজ্জামান
পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট-৩১০০।

উত্তর: মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। তবে সেখানে সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৭০)। আব্দুল্লাহ বিন মুলায়কা থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা একদিন কোনো কবরের দিক থেকে আসলেন। আমি তাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেন, আমার ভাই আব্দুর রহমানের কবর থেকে। আমি তাকে বললাম, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি নিষেধ করেছিলেন, আবার আমাদের

যিয়ারতের আদেশ দিয়েছেন (সুনানে কুবরা, হা/৭২০৭; মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, হা/১৩৯২)। তবে ঘন ঘন যিয়ারত করতে পারবে না। হাসসান ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৭৪)।

প্রশ্ন (১৮): দান করার জন্য নতুন টাকা কিছু মূল্য বেশি দিয়ে ক্রয় করার বিধান কী?

-ফাইয়াজ আহমেদ
বড় বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর: উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন টাকার পরিবর্তে টাকা কম-বেশি মূল্য দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। একই মুদ্রায় কমবেশি করতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, তা স্পষ্ট সূদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে দীনার, উভয়ের মধ্যে কোনোটি বেশি হতে পারবে না এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম উভয়ের মধ্যে কোনোটি বেশি হতে পারবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৬১)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম সমান সমান হওয়া চাই। যে বেশি দিবে বা বেশি নিবে সে সূদের কারবার করল (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৮০)।

প্রশ্ন (১৯): নামের সাথে জান্নাতী শব্দ যোগ করা যাবে কি? যেমন- সাদিয়া ইসলাম জান্নাতী।

-রাশেদুল ইসলাম
সখিপুর, বালারহাট, শরীয়তপুর।

উত্তর: নাম নির্বাচনে পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সুন্দর ও অর্থবহ ইসলামী নাম রাখা। হাদীছে নিষেধকৃত, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বা খারাপ অর্থ বহন করে বা নিজেকে তাযকিয়া করা হয় এমন কোনো নাম রাখা যাবে না। জান্নাতী নামের দ্বারা নিজের তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ বুঝানো হয়ে থাকে। তাই এমন নাম না রাখাই উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরুকে' (আন-নাজম, ৫৩/৩২)।

প্রশ্ন (২০): বর্তমান সময়ে নিলামে হাট ডাকা কি জায়েয?

-রওশন
ঘোড়াহাট।

উত্তর: নিলামের মাধ্যমে কোনো কিছু বিক্রি করা ইসলামী শরীআতে বৈধ। আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি লোকেদের (ছাহাবায়ে কেরামকে) দেখেছি যে, তারা গনীমতের মাল অধিক মূল্য দানকারীর কাছে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না (ছহীহ বুখারী, হা/২১৪১)। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তারপর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'একে কে আমার নিকট হতে ক্রয় করবে?' নুআঈম ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁর কাছ হতে সেটি এত এত মূল্যে ক্রয় করলেন এবং তিনি গোলামটিকে তার নিকটে হস্তান্তর করে দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২১৪১)। উক্ত নিলামে যদি ধোঁকা, প্রতারণা বা অস্পষ্টতা না থাকে এবং উক্ত হাটে বিক্রিত পণ্য যদি হারাম না হয়, তাহলে তা নিলামে ক্রয় করাতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (২১): আমাদের মসজিদে মুন্তাখাব হাদীছ ও ফাযায়েলে আমল বই এশার ছালাতের পর পড়া হয় এবং পড়া শেষ করে মুনাজাত করা হয়। সেখানে বসা যাবে কি?

-ইউসুফ আলী
দিনাজপুর সদর।

উত্তর: মাঝে মাঝে মসজিদে ছালাতের পর দ্বীনী আলোচনা করা বা হাদীছের বই পড়ে জনগণকে শোনানো প্রশংসনীয় কাজ। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে নছীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত বোধ না করি (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮) এবং তা অবশ্যই হতে হবে কোনো বিশুদ্ধ কিতাব থেকে। যেমন- ছহীহুল বুখারী বা ছহীহ মুসলিম। যদি সেখানে দ্বীনের বিশুদ্ধ আলোচনা না হয় বা বিদআতের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকে, তাহলে সেখানে বসা যাবে না। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা কোনো এক মসজিদে মুয়াযযিনের তাসবীব শোনা মাত্রই এ বলতে বলতে মসজিদ হতে বের হয়ে আসলেন, এ বিদআতীর কাছ থেকে আমাদের বের করো। তিনি সেখানে ছালাত আদায় করলেন না (আবূ দাঊদ, হা/৫৩৮; তিরমিযী, হা/১৯৮)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমি জানতে পেরেছি সে বিদআতে জড়িত। তার কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে না (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬২০৭)। একদল গোষ্ঠির প্রসিদ্ধ বই ফাযায়েলে আমল বা মুন্তাখাব হাদীছে অনেক জাল-যঈফ হাদীছ ও বানোয়াট ঘটনা পাওয়া যায়, যার কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় এর মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে বিশুদ্ধ কোনো বই পড়ার ব্যবস্থা করা উচিত। আর কোনো বৈঠক শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের কোনো দলীল নেই।

প্রশ্ন (২২): সোশ্যাল মিডিয়ায় কথোপকথনের সময় ইমোজি ব্যবহার করা কি জায়েয?

-নাঈম ইসলাম
খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তর: ইমোজি মূলত মানুষের বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেসব ইমোজি ও স্টিকারে প্রাণীর মুখমণ্ডল কিংবা প্রাণীর পূর্ণ দেহাবয়ব স্পষ্ট থাকে সেগুলো ব্যবহার করা হারাম ও কবীরা গুনাহ (ছহীহ বুখারী, হা/২২২৫)। অথবা যেসব ইমোজিতে শয়তানের সিম্বল, বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয়, সেসব ইমোজি ব্যবহার করাও হারাম (আবূ দাঊদ, হা/৩৫১২)। আর যেসব ইমোজিতে প্রকৃত মুখের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যেমন- চোখ, মুখ, নাক, মাথা ও কান নেই, সেগুলো নিষিদ্ধ ছবির আওতাভুক্ত হবে না (মাজমূ ফাতাওয়া লি উছায়মীন, ২/২৭৯)।

প্রশ্ন (২৩): টি-শার্টে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ ইত্যাদি লেখার উপর বিজনেস চলছে। এমন টি-শার্ট ব্যবহার করা বা এটা দিয়ে বিজনেস করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ মামুন
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর: আল্লাহ তাআলার নাম বা কুরআনের কোনো আয়াত লেখা রয়েছে এমন কোনো পোশাক পরিধান করা যাবে না এবং এমন কোনো পোশাক দিয়ে ব্যবসা করাও যাবে না। কেননা তাতে আল্লাহর নাম ও তার আয়াতকে অপমান করা হয়। কারণ পোশাকে নাপাকী লাগতে পারে, মানুষ তা পরিহিত অবস্থায় ইস্তিঞ্জা করতে যায়, অনেক সময় মানুষ পোশাকের উপর বসে। তাই আল্লাহর নাম দিয়ে পোশাক তৈরি করা বা পরিধান করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়ারই বহিঃপ্রকাশ' (আল-হজ্জ, ২২/৩২)। তবে আল্লাহর নাম বা কুরআনের আয়াত ব্যতীত শিক্ষামূলক কথাবার্তা, উত্তম আচরণে উদ্বুদ্ধকরণের বিভিন্ন বাণী লেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৪): আমি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু জমি দান করেছি, বিনিময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অফিস সহায়ক পদে চাকরির শর্ত আরোপ হয়েছে। আমার এই দান টা কি জায়েয হবে নাকি ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে?

-জোবায়েদ জুয়েল
রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: ছাদাকা নিঃস্বার্থভাবে করা উচিত। দানের বিনিময়ে কোনো প্রকার পার্থিব সুবিধা বা লাভের আশা করা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা দান-খয়রাতকে খোঁটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে বিনষ্ট করো না' (আল-বাকারা, ২/২৬৪)। দানের বিনিময়ে চাকরি বা অন্য কোনো সুবিধা চাওয়া ঘুষ হিসেবেই ধর্তব্য হবে। কেননা কারো হক্ব বিনষ্ট করা কিংবা কোনো অন্যায়কে কার্যকর করার জন্য কাউকে কোনো কিছু দেওয়াই হলো ঘুষ। আর আল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)। সুতরাং এমতাবস্থায় কোনো শর্ত ছাড়াই দান করতে হবে।

প্রশ্ন (২৫): হিন্দু প্রতিবেশী 'পৌষ সংক্রান্তি' উপলক্ষ্যে পিঠা বানিয়ে আমাদেরকে দিয়েছে। এটা কি খাওয়া যাবে?

-সোনিয়া
সিলেট।

উত্তর: 'পৌষ সংক্রান্তি' হলো বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিন এবং মকর মাসের শুরু। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এটা একটি অত্যন্ত পবিত্র দিন। এই দিনে সূর্য দেবতা মকর রাশিতে প্রবেশ করেন, যা নতুন শুরু ও শুভ ঘটনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পালন করা হয়। এই দিনে হিন্দুরা গঙ্গাস্নান করে, বিশেষভাবে সূর্য উপাসনা করে, নতুন ফসল উৎসব হিসেবে উদযাপন করে এবং বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করে, যেমন- পিঠা, পায়েস ইত্যাদি। সুতরাং এটি হিন্দু ধর্মের একটি ধর্মীয় উৎসব। আর কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের উদ্দেশ্যে তৈরি করা খাবার খাওয়া জায়েয নয়। কেননা এর মাধ্যমে তাদেরকে সম্মান করা হয়, তাদের শিরকী কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা নিষিদ্ধ (আল-মায়েদা, ৫/২)। তাই তাদের উৎসবের উক্ত পিঠা খাওয়া যাবে না আর ইসলামে শুভ-অশুভ সময় বলে কিছুই নাই। ইসলামে সকল দিনই আল্লাহর দিন। তাই এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকেও দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৬): কোনো মেয়ে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম কবুল করলে বিয়ের ক্ষেত্রে সেই মেয়ের অভিভাবক কে হবে?

-কামরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: মুসলিম নারীর জন্য পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা জায়েয নয় (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২)। তবে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী নারী পিতা যদি মুসলিম না হয় অথবা পিতা মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার অভিভাকত্ব দেশের শাসক অথবা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরের উপর বর্তাবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করল, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। যদি সহবাস করে ফেলে, তাহলে সহবাস করার কারণে স্ত্রী মোহর পাবে। আর যদি অভিভাবক নিয়ে বিতর্ক হয়; তাহলে যে নারীর অভিভাবক নাই, তার অভিভাবক হবে শাসক'

(আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩)। তাই নও মুসলিম নারীর অভিভাবক না থাকলে তার অভিভাবক হবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অথবা স্থানীয় কাযী কিংবা এলাকার বড় কোনো আলেম অথবা মসজিদের ইমাম।

প্রশ্ন (২৭): মেয়েদের মাহরাম ব্যতীত ছাত্রী হোস্টেলে থেকে ছহীহ দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণে ইসলামের বিধান কী? যেমন- মহিলা মাদরাসার হোস্টেল।

-নুরুল ইসলাম
কুমিল্লা।

উত্তর: মহিলাদের হোস্টেল চলতে পারে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে- ১. তাদের যাতায়াত মাহরাম দ্বারা হতে হবে। ২. তাদের থাকার ব্যবস্থা নিরাপদ হতে হবে। ৩. সেখানে পুরুষমুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। কেননা মহিলারা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে বা কোনো পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মেয়েরা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোনো পুরুষ কোনো মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬২)। তাই কোনো ছাত্রীনিবাসে যদি পূর্ণ নিরাপত্তা ও পর্দার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে মেয়েরা সেখানে অবস্থান করতে পারে এবং দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন (২৮): কলম, রাবার, পুরাতন ক্যালকুলেটর, স্কেল ইত্যাদি কুড়িয়ে পেলে ব্যবহার করা যাবে কি? লক্ষণীয় যে, এসব বস্তু সাধারণত হারিয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা তেমন খোঁজ করে না।

-আরিফ
পারুয়ারা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর: কলম, রাবার, স্কেল, পুরাতন ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ছোট ও সাধারণ জিনিস কুড়িয়ে পেলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে আগে আশেপাশে মালিকের সন্ধান করার চেষ্টা করতে হবে এবং পরবর্তীতে মালিক এসে দাবি করলে তাকে তার মূল্য বা একই রকম জিনিস ফেরত দিতে হবে। যায়েদ ইবনু খালিদ জুহানী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন এসে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে পড়ে থাকা বস্তু গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এক বছর যাবৎ এর ঘোষণা দিতে থাকো। তার থলে ও তার বাঁধন স্মরণ রাখো। এর মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি আসে এবং তোমাকে তার বিবরণ দেয় (তবে তাকে দিয়ে দিবে), নতুবা তুমি তা ব্যবহার করবে'। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! হারানো বস্তু যদি ছাগল হয়? তিনি বললেন, 'সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের জন্য'। সে আবার বলল, হারানো বস্তু উট হলে? নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এতে তোমার কী প্রয়োজন? তার সাথেই ক্ষুর ও পানির পাত্র রয়েছে, সে পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪২৭)।

প্রশ্ন (২৯): জমিদাতা তার মৃত বাবার নামে মসজিদের নামকরণ করেছেন। মসজিদের নাম 'ইসমাঈল শাহ বায়তুল হামদ জামে মসজিদ'। এখন এই মসজিদে ছালাত আদায় হবে কি? এ মসজিদের নাম রাখা যাবে কি?

-ডা. রহমাতুল্লাহ
রানীরবন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: কোন গোত্র বা ব্যক্তির নামে মসজিদের নামকরণ করা জায়েয। তবে না করাই উত্তম। কেননা এর দ্বারা ব্যক্তির মাঝে রিয়া বা লৌকিকতা আসতে পারে। ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন, অমুকের মসজিদ বলা যায় কি? আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য তৈরি ঘোড়াকে 'হাফয়া' (নামক স্থান) হতে 'ছানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরি নয়, সে ঘোড়াকে 'ছানিয়া' হতে মসজিদে বানী যুরাইক পর্যন্ত দৌঁড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪২০)। বনু যুরাইক একটি গোত্রের নাম। এমন মসজিদে ছালাত আদায়ে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩০): আমি একজন ওয়েবসাইট ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছি এবং পেশাগত কারণে বিভিন্ন ব্যবসা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করতে হয়, যার মধ্যে নারীদের ছবি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাধারণত এই ছবিগুলো স্বাস্থ্যসেবা, সৌন্দর্যসেবা, ফ্যাশন, কর্পোরেট ও অন্যান্য পেশাদার খাতের জন্য ব্যবহার করা হয়। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে এই ধরনের ছবি ওয়েবসাইটে ব্যবহারের বিধান কী? যদি ছবিগুলো শালীন হয় এবং কোনো অশালীনতা বা ফিতনার কারণ না হয়, তবুও কি এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হবে? এছাড়াও যদি ক্লায়েন্ট সরাসরি নারীদের ছবি ব্যবহারের অনুরোধ করে, তাহলে একজন মুসলিম ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে আমার জন্য করণীয় কী হবে? এটি কি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য, নাকি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে বৈধ হতে পারে?

-মোহাম্মদ আলী
দিনাজপুর।

উত্তর: নারীদের পুরো শরীর পর্দার অন্তর্ভুক্ত (তিরমিযী, হা/১১৭৩)। সুতরাং যেভাবেই নারীদের ছবি উপস্থাপন করা হোক না কেন তা বৈধ হবে না। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহিলারা হচ্ছে আবরণীয় বস্তু। সে বাইরে বের হলে শয়তান তাকে সুসজ্জিত করে তোলে (তিরমিযী, হা/১১৭৩)। তাই নারীদের ছবি ব্যবহার করে ওয়েব ডিজাইন করা শরীআত সমর্থন করে না। কেননা এর মাধ্যমে অশ্লীলতা ও ফিতনায় সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। এমতাবস্থায় কোনো প্রাণীর ছবি বা শরীআত সমর্থন করে না এমন কিছু না থাকলে তা জায়েয হবে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩১): আমি সিদ্ধ ডিমের ব্যবসা করি। বসার জায়গা না থাকায় কাস্টমাররা দাঁড়িয়ে ডিম খায়। এতে কি আমার ব্যবসা হালাল হবে বা আমার কোনো পাপ হবে?

-মো. লুলু
নীলফামারী।

উত্তর: যেকোনো পানাহার বসে করাই সুন্নাত। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোনো লোককে দণ্ডায়মান হয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন, আমরা বললাম, তবে খাবারের ব্যাপারে (আদেশ কী)? তিনি বললেন, 'সেটা তো আরো নিকৃষ্ট, আরো জঘন্য' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫১৭০)। তাই বসার ব্যবস্থা করা উচিত। তবে কাস্টমার দাঁড়িয়ে খাওয়াতে ব্যবসা হারাম বা কোনো পাপ হবে না। কেননা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করেছি এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছি (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩০১)।

প্রশ্ন (৩২): সূদ না খেলেও NGO তে চাকুরি করে যে বেতন পাওয়া যায় সেই টাকা হালাল নাকি হারাম?

-নুরুজ্জামান
রংপুর।

উত্তর: Non-Governmental Organization (NGO) বা বেসরকারি সংস্থাগুলোর বেশিরভাগই সূদের সাথে জড়িত। তাই এমন প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো ব্যক্তি সরাসরি সূদের কারবারের সাথে জড়িত কোনো পদে চাকরি করে যেমন- সূদদাতা, গ্রহীতা, লেখক বা সাক্ষী হিসেবে; তাহলে তার প্রাপ্ত বেতন হালাল নয়। কেননা জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সূদখোরের উপর, সূদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষী দুজনের উপর এবং বলেছেন এরা সবাই সমান (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৭)।

প্রশ্ন (৩৩): ইসলামী ব্যাংকে Fixed Deposit বা সঞ্চয় করা কি ঠিক?

-তানযীম
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর: আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী শরীআহ মোতাবেক চলার দাবিদার হলেও তাদের বিনিয়োগে যথাযথভাবে শরীআতের নীতিমালা মান্য করা হয় না। তাই এসব ব্যাংকে ডিপিএস, এফডিআর বা অন্য কোনো সেভিংস একাউন্টে টাকা রেখে অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করলে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাকারা, ২/২৭৫)।

প্রশ্ন (৩৪): কিস্তির টাকা বা সামান্য হারামের সংমিশ্রণে উপার্জিত টাকা বা সম্পূর্ণ হারাম উপায়ে উপার্জিত টাকা, ভালো কোনো ব্যবসায় যেমন- গরু-ছাগলের খামার, কৃষিজ যন্ত্রপাতি বা ফসল উৎপাদন, গার্মেন্টস, যানবাহন, যেকোনো ধরনের দোকান প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করলে সেখান থেকে উপার্জিত টাকা হালাল হবে নাকি হারাম হবে?

-মো. সাঈদুর রহমান সাঈদ
বগুড়া।

উত্তর: যেহেতু মূলধন হারাম তাই তা থেকে উপার্জিত অর্থও হারাম হবে। কেননা ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ হালাল হওয়ার জন্য ব্যবসায়িক পণ্য বৈধ ও পবিত্র হতে হবে এবং তার অর্থও হালাল হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (আল-বাকারা, ২/১৬৮)। হারামকে হালাল করার জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। যেমন- আল্লাহ যখন ইয়াহূদীদের উপর চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে (ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৬)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৫): আমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ করা কি আমার জন্য জায়েয হবে?

-শোআইব
টাঙ্গাইল সদর।

উত্তর: আপনার সৎমার সাথে আপনার বাবার মিলন হওয়ার কারণে তার মেয়ে আপনার বৈপিত্রেয় বোন বা সৎবোন। তাকে আপনার জন্য বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ভাই-বোনে বিবাহ করা হারাম করেছেন; যদিও তারা অন্য মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে..' (আন-নিসা, ৪/২৩)। সুতরাং তারা মাহরাম বলে বিবেচিত হবে। তাদেরকে বিবাহ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৬): হিল্লা বিয়ে হারাম ও বাতিল। এর ফলে সংগঠিত সম্পর্ক যেনা হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে এই বিয়ে থেকে বের হতে তালাক ও ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-শাহানাজ
বগুড়া।

উত্তর: আমাদের সমাজের প্রচলিত হিল্লা প্রথা একটি জাহেলী প্রথা। ইসলামে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাই যেহেতু তা বিবাহই না, সুতরাং এর জন্য তালাক বা ইদ্দত পালনের বিধান নেই। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে জানাব না? সেই পাঁঠা হলো হিল্লাকারী। আর আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিশাপ করেছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৩৬)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় এটিকে যেনা বলে গণ্য করতাম (সুনানে কুবরা, হা/১৪৩০৫)। বরং শারঈ পদ্ধতি হলো, স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহলে সেই স্বামীর জন্য ঐ মহিলা হারাম হয়ে যাবে। এরপর ঐ মহিলার কোনো চুক্তি ছাড়াই যদি দ্বিতীয় বিবাহ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় বা দ্বিতীয় স্বামী মারা যায়, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আগের স্বামী চাইলে তাকে বিবাহ করতে পারে। এছাড়াও সমাজে প্রচলিত হিল্লা প্রথা ইসলামের জন্য অবমাননাকর।

প্রশ্ন (৩৭): একজন পিতার একাধিক ছেলে ও মেয়ে থাকায় ছেলেরা বিবাহের পরে বাবার সংসারে খেয়ে ও কাজ করে যৌথভাবে জমি ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে কি ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী সকল জমির ভাগ দিতে হবে?

-পিয়াস মাহমুদ
জামালপুর।

উত্তর: পিতা-মাতা থাকাবস্থায় তাদের সম্পত্তি দ্বারা উপার্জন করে যদি ছেলেরা যৌথভাবে জমি ক্রয় করে থাকে এবং তা পিতার নামে নথিভুক্ত হয়ে থাকে, তবে তা পিতার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তিও শরীআহ অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে এবং মেয়েরা তাদের পূর্ণ অংশ পাবে। আর যদি কেউ নিজে পৃথকভাবে উপার্জন করে তা দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণের পর জমি ক্রয় করে, তবে তা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এটি পিতার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' (আন-নিসা, ৪/১১)।

প্রশ্ন (৩৮): এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয় এবং তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকে। রাজাআত করার সুযোগ কি তিন মাস নাকি তিন মাসিক হয়? কারণ অনেক মেয়ের তিন মাসের কম সময় লাগে আবার যাদের অনিয়মিত মাসিক তাদের তিন মাসের অধিক সময় ৬/৭ মাস এর কম বা বেশি লাগে, তাহলে ইদ্দত পালন ও ফিরিয়ে নেওয়ার সময় কোনটা হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: তিন মাস নয়, মূলত তিন পবিত্রতা। তবে অনেক সময় তাদের বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কারণে পবিত্রতাকে ৩ মাস বা ৯০ দিন ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই তালাকের পর তিন হায়েয বা মাসিকের মাঝে স্বামী বিবাহ ছাড়াই স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে' (আল-বাকারা, ২/২২৮)। তিন মাসিক বা পিরিয়ড পূর্ণ হতে তিন মাসের কম বা বেশি যে সময়ই প্রয়োজন হোক না কেন তা পূর্ণ করতে হবে। তাই তৃতীয় হায়েয থেকে গোসল করার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেরত নেওয়া যাবে (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১০৯৮৩)।

প্রশ্ন (৩৯): মেয়েদের কোন নামগুলো আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? মেয়েদের নাম রাখার ক্ষেত্রে কোন নামগুলো রাখা উচিত?

-মেহেদী হাছান
নীলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর: মেয়েদের সর্বোত্তম নামের ব্যাপারে কোনো হাদীছ পাওয়া যায় না। মেয়েদের নাম রাখার ক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী, কন্যাগণ ও অন্যান্য মহিলা ছাহাবীদের নামে নাম রাখা উত্তম। যেমন- আয়েশা, খাদীজা, মারিয়াম, যায়নাব, ফাতেমা, হালিমা, আমেনা, মায়মূনা, ছাফিয়্যাহ, হাফছা, হাবীবা ইত্যাদি।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪০): আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ব্যতীত কাউকেও সাথী

হিসেবে গ্রহণ করো না আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩২; তিরমিযী, হা/২৩৯৫; মিশকাত, হা/৫০১৮)। এই হাদীছে বলা হয়েছে পরহেযগার ব্যতীত আমার খাবার যেন কেউ না খায়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, কোনো অমুসলিমকে অথবা কোনো বেনামাযীকে কি খাবার দেওয়া যাবে না?

-মো. হামিদুল ইসলাম রূপম
হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট।

উত্তর: অত্র হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াতের খাবার; অভাব বা প্রয়োজনের খাবার নয় (শারহুল মাছাবীহ লি ইবনিল মালিক, হা/৩৯০২)। এখানে মূলত পরহেযগার ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব তৈরির জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই ফকির-মিসকীন যদি খাবার চায়, তারা মুত্তাক্বী না হলেও তাদের খাবার দেওয়া যাবে। সায়েলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না' (আদ-দোহা, ৯৩/১০)। তিনি আরো বলেন, 'তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার খাওয়ায়' (আল-ইনসান, ৭৬/৮)। এটা জানা কথা যে, তাদের বন্দিগণ কাফের ছিল।

প্রশ্ন (৪১): নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগে মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছেন, তারপর মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছেন! এই হাদীছটির কতটুকু সত্যতা আছে? বিস্তারিত দলীল সহকারে জানতে চাই।

-পিয়াস মাহমুদ
জামালপুর, ইসলামপুর।

উত্তর: এটি একটি বানোয়াট মিথ্যা ঘটনা, যার কোনো সনদ পাওয়া যায় না। তারা ঘটনাটি এভাবে বলে থাকে, একবার এক ছাহাবী নিজ সন্তানকে নিয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার ছেলে খুব বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ করে, দয়া করে আপনি তাকে বারণ করুন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তিন দিন পরে এসো'। ছাহাবী তিন দিন পরে এলে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ছেলেকে মিষ্টি খাওয়া থেকে বারণ করলেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেন তিন দিন পরে আসতে বললেন, এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'এই তিন দিনে আগে আমি নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছি, তারপর তাকে নিষেধ করেছি'। উল্লেখ্য, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা বলার পরিণাম জাহান্নাম (ছহীহ বুখারী, হা/১০৭)। এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হালাল জিনিস কেন হারাম করবেন! আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা হারাম করছেন কেন?' (আত-তাহরীম, ৬৬/১)।

প্রশ্ন (৪২): জনৈক বক্তা বলেছেন, 'ছালাতে রাফউল ইয়াদাইন করলে প্রতি রাফউল ইয়াদাইনে দশ নেকী পাওয়া যায়'- হাদীছটি কি ছহীহ?

-রহমত আলী
আসাম, ভারত।

উত্তর: জি, উক্ত কথাটি সঠিক। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের ছালাতে তার হাতের ইশারা দ্বারা ১০ করে নেকী লেখা হয়। তার প্রত্যেক আঙুলে একটি করে নেকী লেখা হয়' (সিলসিলা ছহীহা, হা/৩২৮৬; দায়লামী, ৪/৩৪৪; কানযুল উম্মাল, হা/১৯৮৮০)।

প্রশ্ন (৪৩): আমি একটা হাদীছ পড়েছি যে, কোনো ব্যক্তি ৪০ দিন তাকবীর উলার সহিত জামাআতে ছালাত আদায় করলে তার নাম জাহান্নাম এবং মুনাফিকী থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সুযোগ কি মহিলাদের নেই? মহিলারা তো চাইলেও জামাআতে ৪০ দিন ছালাত আদায় করতে পারবে না। কারণ মহিলাদের ৩০ দিন পর পর হায়েয শুরু হয়ে যায়।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: এই হাদীছ পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য, কারণ মহিলাদের জন্য জামাআতে ছালাত আদায় করা ফরয নয়। এখানে মূলত জামাআতে ছালাত আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মসজিদের থেকে ঘরে ছালাত আদায় করা উত্তম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারীদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় ছালাত আদায়ের চাইতে তার গৃহে ছালাত আদায় করা উত্তম। আর নারীদের জন্য গৃহের অন্য কোনো স্থানে ছালাত আদায়ের চাইতে তার গোপন কামরায় ছালাত আদায় করা অধিক উত্তম' (আবূ দাঊদ, হা/৫৭০)। এরপরেও কোনো মহিলা জামাআতে ছালাত আদায় করলে আল্লাহ দয়া দিয়ে তা পূর্ণ করে দিবেন। এক পবিত্রতায় তার জন্য চল্লিশ দিন। সাথে সাথে অনেক মহিলার বয়স বেশি বা কম হওয়ার কারণে ঋতু থাকে না। তখন সে স্বাভাবিকভাবেই ৪০ দিনের ফযীলত ধরতে পারে।

প্রশ্ন (৪৪): বান্দার হক্ব নষ্টকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যদি না সেই বান্দা তাকে ক্ষমা করে। এর দলীল কী?

-মো. রকিব আজম
বাসা-৫৬, রাস্তা-১৫/এ, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর: বান্দার হক্ব নষ্টকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন

তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার যুলমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মাযলূমের হক্ব কেবলমাত্র তওবা দ্বারা পূরণ হয় না। বরং তওবা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন সে যুলমের প্রতিদান মাযলূমকে বুঝিয়ে দিবে। যদি সে দুনিয়াতে তা পূরণ না করে, তবে আখেরাতে তাকে তা পূরণ করতে হবে (মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৮/১৮৭-১৮৯)। কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বান্দার সাথে যুলম সংশ্লিষ্ট কোনো পাপ হলে তার প্রাপ্য ব্যক্তিকে না ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তওবা সঠিক হবে না (আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ১৮/১৯৯)।

প্রশ্ন (৪৫): জনৈক আলেম বলেন, যেখানে যে আমল প্রচলন আছে সেখানে সেই আমলই করতে হবে এবং সংখ্যায় যেখানে বেশি সেখানে সেইভাবে নাকি আমল করতে হবে। যেমন-আমাদের মসজিদের অধিকাংশ হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে ছালাত আদায় করে, রাফউল ইয়াদাইন করে না, সশব্দে আমীন বলে না, তারপর ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাত করে ইত্যাদি। আমাদের নাকি সেই অনুযায়ী ছালাত আদায় করতে হবে। এটার কোনো ভিত্তি আছে কি?

-কবিরুল ফয়াজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: এটি একটি বানোয়াট ভিত্তিহীন কথা। বরং সর্বাবস্থায় কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের প্রতি নিঃশর্ত আমল করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত' (মুওয়াত্ত্বা, হা/৩; তিরমিযী, হা/৪১২০)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মূসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে জান্নাতী দল কোনটি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সেই মত ও পথের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারাই জান্নাতী দল' (তিরমিযী, হা/২৬৪১)। এমনকি সকল ইমামগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছ যেটি ছহীহ সেটাই আমার মাযহাব (রাদ্দুল মুখতার, ১/১৫৪; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীখ, ১/৬৩)। ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তোমরা আমার কোনো কথা হাদীছের সাথে গড়মিল দেখতে পাও, তাহলে তোমরা হাদীছ অনুযায়ী আমল করো, আমার নিজের উক্তিকে দেয়ালে ছুড়ে ফেলো' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/৩৫৭)। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি নিছক একজন মানুষ। ভুল করি, শুদ্ধও করি। তাই আমার মতামতকে যাচাই করে নিও। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যতটুকু মিলে সেটুকু গ্রহণ করো আর গড়মিল পেলে সেটুকু বাদ দিয়ে দিও (ঈকাযুল হিমাম, পৃ. ১০২)। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না। মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ, ছাওরী তাদেরও না; বরং তারা যেখান থেকে (সমাধান) নিয়েছেন তুমিও সেখান থেকেই নাও (ঈ'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৩০২)।

প্রশ্ন (৪৬): আমাদের স্কুলের পাঠ্য বইতে জান্নাতের সংখ্যা ৮টি এবং জাহান্নামের সংখ্যা ৭টি দেওয়া আছে। এই পরিসংখ্যান কি সঠিক? কুরআন হাদীছের আলোকে জবাব দিলে খুবই উপকৃত হতাম।

-মিজানুর রহমান ভুঁইয়া
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: জান্নাত ৮টি এবং জাহান্নাম ৭টি বলে সমাজে প্রচলিত থাকলেও তার কোনো দলীল পাওয়া যায় না। বরং জান্নাতের দরজা ৮টি ও জাহান্নামের দরজা ৭টি। সাহল ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতের ৮টি দরজা রয়েছে। এর মধ্যে 'রাইয়্যান' নামে একটি দরজা রয়েছে, ছিয়াম পালনকারীগণ ছাড়া এ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৫৮)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ওর (জাহান্নামের) সাতটি দরজা আছে' (আল-হিজর, ১৫/৪৪)। এছাড়া জান্নাত ও জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে (তিরমিযী, হা/২৫৩১)।

প্রশ্ন (৪৭): মা-বাবার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজ্জের নেকী পাওয়া যায়, এই কথাটি কি সঠিক?

-মারুফ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: এ বিষয়ে যে হাদীছ পাওয়া যায় সেই হাদীছটি জাল। হাদীছটি হলো, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো মাতা-পিতার সন্তান নিজের মাতা-পিতাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি হজ্জ এর ছওয়াব লিখে দেন'। ছাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি দৈনিক একশ বার দৃষ্টিপাত করে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তাও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র' (শুআবুল ইমান, হা/৭৪৭২; মিশকাত, হা/৪৯৪৪)।

দু'আ

প্রশ্ন (৪৮): কবর যিয়ারতের সময় ওযূ থাকতে হবে কি? কবর যিয়ারতের দু'আসমূহ জানাবেন।

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর।

উত্তর: কবর যিয়ারতের সময় ওযূ করা শর্ত নয়। কেননা যে সমস্ত কাজে ওযূ শর্ত কবর যিয়ারত তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কবর যিয়ারতের দু'আ হলো, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ 'আস-সালামু আলায়কুম আহলাদ দিয়া-র মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না- ইনশা-আল্ল-হু বিকুম লা-হিকূনা নাসআলুল্ল-হা লানা- ওয়ালাকুমুল আ-ফিয়াহ' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৫৪৭)। এছাড়াও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। এ দু'আটি বলতে পারে- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ (ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৪)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): ঘরে অঙ্কিত ছবি থাকলে ফেরেশতা আসে না, আমাদের দেশের টাকায় তো ছবি রয়েছে, তাহলে কি ফেরেশতা আসবে না?

-সারোয়ার
লালমনিরহাট।

উত্তর: ছবি ঘরে থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না, এ কথাই ঠিক। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে বাড়িতে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতামণ্ডলী প্রবেশ করে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩২২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে কোনো বালিশ বা গদিতে ছবি দেখে দরজার বাহিরেই দাঁড়িয়ে থেকেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)। ছবিযুক্ত কাপড় দেখে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন, দাওয়াত গ্রহণ করেননি (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৬০)। ছবির কারণে উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বিত্তশালী খ্রিষ্টানের বাসায় দাওয়াত কবুল করেননি। তবে টাকার বিষয়টি নিরুপায়। তাই ঘরের যত্রতত্র টাকা ফেলে রাখা বা ছালাত আদায় করা যাবে না।

প্রশ্ন (৫০): আমাদের গ্রামে একটি মাদরাসা আছে। সেখানে অনেক বিদআতী ও শিরকী আমল প্রচলিত আছে। প্রতি বছর সমাজের প্রতিটি সদস্যদের কাছে মাদরাসার জন্য চাঁদা ধরা হয়। আমার চাঁদা ধরা হয়েছে ৩ হাজার টাকা। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: স্পষ্ট বিদআতী বা শিরকী কাজের সাথে সম্পৃক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা শিরক-বিদআত যেহেতু সবচেয়ে বড় অপরাধ, সেহেতু এজন্য কোনো সহযোগিতা করাও বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সেই ব্যক্তি তার ঈমান পূর্ণ করল, যে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে দান-খায়রাত করে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে দান করা হতে নিবৃত্ত থাকে (তিরমিযী, হা/২৫২১)। তিনি আরো বলেন, 'যে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে বিদআত করে কিংবা কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয় কিংবা সাহায্য করে তার উপর আল্লাহ তাআলার, ফেরেশতাগণের ও সকল মানব জাতির অভিশাপ। তার কোনো ফরয কিংবা নফল ইবাদত গৃহীত হবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৭১)।

আনাস হোমিও এন্ড হিজামা কেয়ার
মো: মনিরুল ইসলাম হোমিও চিকিৎসক ও হিজামা থেরাপিস্ট, ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
চিকিৎসা সেবাসমূহ
- বিনা অপারেশনে নাকের পলিপাস
- বিনা অপারেশনে পাইলস, টনসিল ও টিউমার
- বিনা অপারেশনে গ্যাস্টিক ও পেপটিক আলসার
- বিনা অপারেশনে কিডনীর পাথর ও মুত্রথলীর পাথর
- বিনা অপারেশনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস
- প্রসাবের ইনফেকশন
- হাঁটু, কোমরের, জয়েন্টের, হাঁড় ক্ষয় ও বৃদ্ধি এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত ব্যথা
- এছাড়াও এলার্জি, চর্ম ও যৌন, শ্বাসকষ্ট, এবং মহিলাদের অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়
(বি.দ্র. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রুগীর সাথে কথা বলে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারের মাধ্যমে ঔষধ পাঠানো হয়)
হুজরীপাড়া (বানকের মোড়), দারুশা, কর্ণহার, রাজশাহী। ০১৭৩৮-১৮২১৪৪ anashomeocare

মাসিক আল-ইতিছাম-এর বর্ষভিত্তিক বোর্ড বাইন্ডিং সংগ্রহ করুন

প্রতি বর্ষ
বোর্ড বাইন্ডিং-এর মূল্য
৪৬০ টাকা

বোর্ড বাইন্ডিং পেতে যোগাযোগ করুন

০১৭৫০-১২৪৪৯০ ০১৪০৭-০২১৮৪০

alitisam2016 al-itisam.com

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam الاعتصام 9th Year, 6th Part, April 2025, Price : 30.00

আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ
আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
বিষয়ভিত্তিক ছহীহ হাদীছসমগ্র

মাকতাবাতুস সালাফ

সিলসিলা ছহীহা
মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

১ম খণ্ড	৫১২ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
২য় খণ্ড	৫৭২ পৃষ্ঠা	৫৮০ টাকা
৩য় খণ্ড	৫০৪ পৃষ্ঠা	৬২০ টাকা

১৬০ টাকা | ৬৫০ টাকা | ৯০ টাকা | ১০০ টাকা | ৯০ টাকা

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত

হজ্জ ও উমরা
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১২৮ মূল্য : ৯০ টাকা

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজিট করুন tubapublication.com

রাজশাহী নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০